কলাম
দেওয়ান আবদুল বাসেত

কলাম
দেওয়ান আবদুল বাসেত

(সুদীর্ঘকাল ধরে যে প্রবন্ধ নিবন্ধগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তাহাই এখানে একই সঙ্গে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো।)

প্রকাশকঃ
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ / সউদী আরব।
৮মে ২০০৬ইং
২৫বৈশাখ ১৪১৩বাঙলা
প্রচ্ছদঃ রতন
স্বত্বঃ ফিকরা বাসেত বৈশাখী

কম্পিউটারে বাংলা কম্পোজঃ
বৃষ্টি এবং নদী

ইন্টারনেট সংস্করণঃ
মরুপলাশ.কম
www.marupalash.com

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত যে নিবন্ধগুলো এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে

* বহুমাত্রিক লেখক ড. হুমায়ুন আজাদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে মরুপলাশ এর শ্রদ্ধাঞ্জলি
* আমাদের দেশীয় এ্যানভায়রনমেন্টে এমনটি কী কল্পনা করা যায়?

* নেভার মাইন্ড
* সউদী আরবে শাওনের বৃষ্টি

* আদর প্রিয় নায়না
* 'রিয়্যালী সি হেভ মিরাক্যাল পাওয়ার'

* রিয়াদে বাঙালি কমিউনিটির বাংলা স্কুলের পর্ষদ নির্বাচন-২০০৫
* বাঙালি কমিউনিটিতে ইপ্তার মাহফিলও ঈদ পুনর্মিলন অনুষ্ঠান বেশ জমজমাট

* কিছু প্রস্তাব, সকল বাংলা ওয়েব ম্যাগাজিনগুলোর সুহৃদ সম্পাদক বন্ধুবরেষু
* চ্যানেল আই এর তৃতীয় মাত্রা একটি পর্ব নিয়ে কিছু কথা
* চ্যানেল আই কর্তৃপক্ষের নিকট মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী বাঙালিদের জিজ্ঞাসা

* এইতো স্বজনবিহীন বিদেশের ঈদ
* তসলিমা নাসরিন এবং তার সকল গৃহ হারালো যার প্রসঙ্গে

* কফিন
* রিয়াদে বাংলা স্কুলের চালচিত্র
(রিয়াদে বাঙালি কমিউনিটির একমাত্র সবে ধন নীলমনি বাংলাদেশ ইন্টাঃ স্কুল এন্ড কলেজ)
* কয়েকটি চিঠি
* রিয়াদে বাংলা স্কুলের বার্ষিক ম্যাগাজিন সমাচার ও জেদ্দার **রোদ্দুর** এর তথাকথিত সম্পাদকের আস্ফালন।
* পরের ধরে পোদ্দারী
* হতাশার অন্ধকারে আলোকিত সংবাদ

* আসুন আমরা বিস্ফোরিত ঘৃণায় এবং প্রতিবাদে ফেটে পড়ি
* মরুপলাশ এর সম্মানিত পাঠক ও লেখকদের অভিযোগের উত্তরে

বহুমাত্রিক লেখক ড. হুমায়ুন আজাদ এর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে
মরুপলাশ এর শ্রদ্ধাঞ্জলি
১২ আগষ্ট ২০০৫ইং

বাংলার মাটিতে ড. হুমায়ুন আজাদ একজন শুধু প্রথাবিরোধী লেখকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন লেখক হিসেবে মুক্ত চিন্তার ধারক-বাহক। সত্য বলায় অত্যন্ত দুঃসাহসী।'একাত্তরে বাংলার মাটি সাধারণ মানুষ, ছাত্র, শ্রমজীবি এবং বহু বুদ্ধিজীবির রক্তে সিক্ত হয়েছে। যা আজও ঝরাতে হচ্ছে মৌলবাদ নামক মহাদানবের উত্থানে। যে দানবকে এখনই রুখতে না পারলে তিরিশ লাখ শহীদের রক্তে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতাই বিপন্ন হবে। মৌলবাদের উত্থান এখন বাংলাদেশে অত্যন্ত ভয়ংকর পর্যায়ে পৌঁছেছে। যাতে ড. হুমায়ুন আজাদ নিজের রক্ত ঢেলে আর একবার প্রমান করেছেন। তিনি প্রয়াত হবার পূর্বেই বিশাল এক প্রশ্ন রেখে গেলেন,- এদেশ থেকে কবে এই রক্ত ঝরা শেষ হবে ?

বরাবরের মতো সেবারও বইমেলা উপলক্ষেই আমি স্বদেশে। বাৎসরিক ছুটি হিসেবে আমি বরাবরের মতো এই ফেব্রুয়ারীকেই বেছে নিই। সঙ্গে ভিডিও ক্যামেরাটি। আশা, যদি কোন বিশেষ ব্যক্তিত্ব পেয়ে যাই। তাহলে একটি সাক্ষাৎকার ধারণ। প্রবাসে তো দেশের মা-মাটি ও মানুষের সান্নিধ্য থেকে আমরা লেখকরা বঞ্চিত। বঞ্চিত দেশের সব কিছু থেকেই। সেখানে যদি কোন একজন বিশিষ্ট লেখক বুদ্ধিজীবির একটি ভিডিও সাক্ষাৎকার সংগ্রহে থাকে। তাহলে তাই হবে আমাদের প্রবাসী লেখকদের কাছে সবচে' লোভনীয়। প্রবাসে হাজারো অতৃপ্তির মাঝে একমাত্র মহাতৃপ্তির। বিশুস্ক মরুর অনানন্দের মাঝে একমাত্র আনন্দের।

১৯৯৯সালের ০৮ ফেব্রুয়ারী বিকেল ৪:৪১মি: ভিডিও সাক্ষাতকারটি ধারণ করি বাংলা একাডেমীর বটতলায়। বর্ধমান হাউজের দোতলায় ড. হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। কিছুক্ষণ কুশল বিনিময়ের পর বলাম- স্যার আপনার একটি ভিডিও সাক্ষাৎকার নিতে চাই আমাদের প্রবাসী লেখকদের জন্যে। বিশেষ করে ১৯৮৭সাল থেকে প্রকাশিত ***মরুপলাশ*** সাহিত্যপত্র ও তার লেখকদের জন্যে আপনার একটি সাক্ষাৎকার আমাদের খুব বেশী প্রেরণা দেবে। আপনার কিছু উপদেশ আমাদের মতো প্রেরণাহীন প্রবাসী লেখকদের প্রেরণা দেবে। সাহস দেবে। তিনি বর্ধমান হাউজ থেকে বেরিয়ে এলেন রমনার ঐতিহাসিক বটমূলে। আমার সঙ্গে ছিলেন ছড়াকার রহীম শাহ। হুমায়ুন স্যার দাঁড়িয়েই কথা বললেন।

তিনি বলতে শুরু করলেন-'ঐ মরুভূমিকে আসলে আমি খুব ভয় পাই! ওখানে যে শিল্প - সাহিত্য - সংস্কৃতি আছে এটাও আমার মনে হয় না। আমি নিজে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যাবার কথা কখনও ভাবতেই পারি না। ঐসব দেশগুলোতে গেলে আমি হয়তো একদিনও বাঁচবো না। ঐসব এলাকায় যে সব নিয়মকানুন রয়েছে, তা মরুভূমির চেয়েও ভয়াবহ'!!

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে না হয় তিনি একদিনও বাঁচতে পারবেন না। কিন্তু তিনি তার প্রিয় ফুটবল দলের সেই জার্মান দেশে গবেষণা করতে গিয়েও বেশীদিন বাঁচতে পারলেন না। তাঁর সেই প্রশ্নবিদ্ধ মৃত্যুটাই আমাদের লেখক সমাজকে শোকের আটলান্টিক মহাসাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে। যার কোন কূল-কিনারা খুঁজে পাই না আজও।

সেই ভিডিও সাক্ষাতকারের শেষ পর্যায়ের বক্তব্যে ড. আজাদ বলেছিলেন – 'আমি অত্যন্ত আনন্দিত, আমাদের থেকে যারা অনেকদূরে চলে গেছেন, তারাও দূরে যাননি। বাংলাভাষা থেকে আপনারা দূরে যাননি। বাংলাদেশ থেকেও দূরে যাননি। আমরা আপনাদের সঙ্গো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছি। যেমন আপনারা আছেন আমাদের সঙ্গো....'

হ্যাঁ। হে মুক্ত চিন্তার মহানায়ক ড. হুমায়ুন আজাদ স্যার, আমৃত্যু আপনার সঙ্গো আমরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছি এবং থাকবো। এখন প্রতিদিনই আপনার সেই সাক্ষাতকারটি দেখে শুধুই অশ্রু ঝরাই। ভাবি আমরা কি পারবো আপনার মৃত্যু রহস্য খুঁজে বের করতে? আমরা কী পারবো মৌলবাদ মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে? আমরা কি পারবো আপনার আদর্শকে, আপনার সেই স্বপ্নকে প্রতিষ্ঠিত করতে? তবে ভরসা আপনার সৃষ্টিই আমাদের প্রেরণা দেবে। সাহস দেবে। দেখাবে পথ-ঘাট।

আগষ্ট ১২, ২০০৫ইং
২০ আগষ্ট ২০০৫ইং দৈনিক যুগান্তর এ 'দেখে আজও অশ্রু ঝরাই' শিরোনামে প্রকাশিত

আমাদের দেশীয় এ্যানভায়রনমেন্টে এমনটি কী কল্পনা করা যায়?

কবি ও চারুশিল্পী বদরুল আলম রতনের সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ***চারুবন*** এর প্রকাশনা উৎসব থেকে ফিরেছি রাত ২টায়। উইকএন্ড বলে পরদিন ডিউটির কোন টেনশান নেই। সবেমাত্র চোখ লেগে এসেছে। হঠাৎ করেই টেলিফোনটা বেজে উঠলো। বিরক্তিবোধে ভাবছি, এতোরাতে কে ফোন করতে পারে!? কিছুক্ষণ ফোনটি বেজে থেমে গেলো। দু'মিনিট পর আবার বাজতে শুরু করলো। ভাবছি নিশ্চয়ই দুরের কোন ফোন কিংবা জরুরী ফোনও হতে পারে। ফোন তুলে নিতেই অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো কিছু আরবী শব্দ....আসলামুআলাইকুম....এ্যানতা দেওয়ান? আনা কাল্লেম মিন সুরতা আল মানফুহা.....আমি তৎপর হয়ে উঠলাম। কেননা ফোনটি ছিলো রিয়াদের মানফুহা থানা পুলিশের কাছ থেকে। তারা জানতে চাইছে আমি দেওয়ান কিনা...আমার হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়া গাড়িটির সন্ধান তারা পেয়েছে। মাত্র দু'দিন আগেই রওদা থানা পুলিশের কাছে আমার ২০০৫ মডেলের টয়োটা ক্যামরি গাড়িটি চুরি হয়ে যাওয়ার ***কেইস ফাইল*** করে এসেছিলাম। মাত্র আটচলিশ ঘন্টার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া গাড়িটি পেতে যাচ্ছি, তা ভেবে আনন্দে দিশেহারা।

এবার একটু ফ্লাশ ব্যাক এ যাই। ' ৮২ মডেলের মাজদা গাড়িটিই আমার জন্যে মঙ্গলময় ছিলো। যা প্রায় ৭/৮ বছর ধরে ব্যবহার করে আসছি। হঠাৎ করেই আমাদের ***ন্যাশনাল গার্ড হেল্থ এ্যাফেয়ার্স*** স্টাফদের জন্যে কর্তৃপক্ষ চার বছরের কিস্তিতে নতুন গাড়ি দেওয়া শুরু করলো। কোন ডাউন পেমেন্ট নেই। চার বছরে বেতন থেকে কেটে নেবে। এমনি সুযোগ যখন সবাই নিচ্ছে। তো আমি আর বাদ যাবো কেন? মাথায় নষ্ট পোকার কামড়ে অস্থির হয়ে পড়লাম। অবশেষে নিয়েই নিলাম ২০০৫মডেলের টয়োটা ক্যামরি জুনিয়র গাড়িটি।

গাড়িটি নেওয়ার মাত্র সপ্তাহ দুয়েক পরে নিজে ড্রাইভ করে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। রিয়াদ থেকে মক্কার দুরত্ব প্রায় নয়শত কিলোমিটার। উদ্দেশ্য ওমরা করবো। না সঙ্গে ফ্যামিলী নেইনি। প্রথমবারে এতো লং ড্রাইভ এ যাচ্ছি তাই বাচ্চা কাচ্চা সঙ্গে নিতে আগ্রহী নই। প্রথমবারে অভিজ্ঞতা নেওয়ার পরই না হয় পরে ভাবা যাবে। সঙ্গে নিলাম ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক সাইফউদ্দিন আহমেদকে। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় যখন আমরা তায়েফ এর কাছে পৌঁছলাম। তায়েফ এলাকায় প্রবেশের পুর্বেই একটি পুলিশ চেকপয়েন্ট। চেকপয়েন্ট পার হয়েই ডানে বাঁক নিতে হয়। তা ভুলে গেলাম বেমালুম। রাস্তা হারিয়ে এখানে ওখানে ঘুরছি। মোবাইলে যোগাযোগ করলাম ***'অভীক'*** সম্পাদক এবং ***পরবাস সমাবেশ*** এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সচিব জেদ্দার কবি তাহের এর সঙ্গে। সে জানালো, আমাদের রাস্তা ভুল হয়েছে। রিংরোড ধরে কোথা থেকে কোথায় চলে গেলাম তার বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারছি না। যখন কিছুটা বুঝতে পারলাম দেখলাম আকাশচুম্বী এক পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে কখনও ইংরেজী বর্ণমালার 'এস' কখনও বা 'জেড' প্রকৃতির রাস্তা ধরে নিচে নেমে আসছি। আমি একা নই। সম্ভবতঃ আমার মতোই পথভুলা আরও বহু গাড়ি।

কখনও কখনও সাইফউদ্দিন বলে উঠছে, আরে ভাই আমরা কোথায় এলাম?! আমরা তো দেখছি একেবারে আকাশের কাছাকাছি। যে গাড়িগুলো প্রায় নিচে পৌছে গেছে, তাদের দেখে মনে হয় যেন রাত জোনাকি এদিক সেদিক উড়া উড়ি করছে। আমি তার কথা কানে শুনছি কিন্তু সেদিকে তাকাবার সুযোগ নেই। প্রায় চল্লিশ- বিয়াল্লিশ মিনিট ড্রাইভ করে অবশেষে নেমে এলাম সমতলে। এসেই পাশের একটি পেট্রোল পাম্পে গাড়ি থামিয়ে কিছু পেট্রোল নিলাম। সেখানে কর্মরত আমাদের একজন বাঙালি ভাইয়ের

কাছে জানতে চাইলাম, এই পাহাড়ের গায়ে উঠে গেলাম কীভাবে? সে ঘটনা বোঝার পর জানালো- আপনারা রিংরোডেই রাস্তা ভুল করেছেন। এমনি অনেকেই করে। আর প্রায়ই এখানে দুর্ঘটনা ঘটে। সে সকল দুর্ঘটনায় যাত্রী এবং গাড়ির কোন হদিসই পাওয়া যায় না। মনে মনে আল্লাহকে সীমাহীন ধন্যবাদ জানালাম। দেশী ভাইটির কাছে আরও জানতে চাইলাম- কোথায় আমরা এহরাম বাঁধবো? সে জানালো- আপনারা রিয়াদ থেকে এসেছেন, রিয়াদের ওমরা যাত্রীদের জন্যে আরও ১৫/২০ কিলোমিটার পেছনে এহরাম বাঁধার স্থান। যেহেতু আপনারা ভুলে এখান পর্যন্ত চলে এসেছেন, তাই একটু সামনে গিয়ে পাহাড়ের উপরে একটি ছোট্ট মসজিদ এবং গোসল করার জায়গা আছে। ইহা শুধুমাত্র তায়েফ থেকে যারা ওমরা করার উদ্দেশে রওয়ানা হয়, তাদের জন্যেই এখানে এহরাম বাঁধার স্থান। নিয়মতো ভঙ্গা হয়েছেই। কী আর করবেন। এখানেই এহরাম বেঁধে ওমরার নিযত করে দু'রাকাত নামাজ পড়ে রওয়ানা হোন। প্রায় তিনটা বাজে। তাই তাড়াতাড়ি করুন। যাতে হেরেম শরীফে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়ে ওমরা করতে পারেন।

আমরা তাই করলাম। মক্কায় পৌঁছে গাড়িটি একটি মালটি পার্কিংএর দোতলায় পার্কিং করে ***বাব আল ফতেহ*** (বিজয়ের দরজা) দিয়ে হারামে প্রবেশ করলাম। ইসলামের ইতিহাসে জানা যায় মক্কা বিজয়ের পর আমাদের নবী করীম (সঃ) এই দরজা দিয়েই হারাম শরীফে প্রবেশ করেছিলেন। সাত চক্কর ঘুরে মানে তওয়াফ পর্ব শেষ করলাম। ওয়াজিব উত্তাওয়াফ এর দু'রাকাত নামাজ মাকামে ইব্রাহীমকে (যে পাথরে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পদচিহ্ন বর্তমান) সামনে রেখে শেষ করতে না করতেই ফজর নামাজের ইকামত পড়ে গেল। সবার সঙ্গে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। নামাজের পর ওমরার বাকী ***রিকয়ারমেন্ট*** গুলো পূরণ করলাম।

সূর্য তখন উঠে গেছে। মালটি পার্কিং এ এসে আমরা কাপড়চোপড় বদলালাম। সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হলাম জেদ্দার কবি তাহেরএর বাসার উদ্দেশে। ই-মেইলেই যার সঙ্গে পরিচয়। আজ যাচ্ছি সরাসরি পরিচিত হতে। সেখানে কিছুটা সময় কাটানো এবং লোহিত সাগর দর্শন। অবশেষে পৌঁছে গেলাম জেদ্দায়। বালাদ নামক এলাকায় পৌঁছেই আমরা মোবাইলে কবি তাহেরকে আমাদের অবস্থানের কথা জানালাম। তখন কবি কক্ষচ্যুত উল্কার মতোই ছুটে এলেন। জেদ্দায় পুরো বৃহস্পতিবার দিনটি কবির সঙ্গে লোহিত সাগরের পাড়ে পা ভিজিয়ে পাথরের উপর বসে বসে কথোপকথন। সে এক চমৎকার সময় উপভোগের ক্ষণ। যা কখনো ভুলার নয়। রাতে কবির আয়োজিত হরেক রকমের সুস্বাদু খাদ্য খেয়ে শরীর মন ক্লান্তিতে ভেঙ্গে আসছিলো। ইচ্ছে হলো ঘুমাবো। কিন্তু তার জো নেই। কেন না রাতেই রিয়াদের উদ্দেশে রওয়ানা হতে হবে। জেদ্দা থেকে রিয়াদের দুরত্ব প্রায় ১২শত কিলোমিটার। এই বিশাল দুরত্ব একা ড্রাইভ করে পোঁছা রীতিমতো কঠিন। আমার সফর সঙ্গী সাইফউদ্দিন বেচারা আবার ড্রাইভ জানে না। বড়োই টেনশানে পড়ে গেলাম। ভাবছি কীভাবে একাকী ড্রাইভ করে রিয়াদ পৌঁছবো। এনিওয়ে আমাকে পোঁছিতেই হবে। রাত দেড়টায় কবি তাহেরকে আন্তরিক আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে রিয়াদের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। প্রায় চল্লিশ মিনিট ড্রাইভ করার পর মনে হলো এবার রিয়াদের রাস্তা ভুল হয়ে গেছে। রিয়াদ থেকে মক্কার পথে একবার রাস্তা ভুল হয়েছিলো। যার জন্যে ঘুরতে হয়েছে প্রায় ২/৩ ঘন্টা। মক্কা যাওয়ার পথে এবং রিয়াদ ফেরার পথে প্রায় একই সময়ে রাস্তা ভুল হওয়াতে বিষয়টি নিয়ে সাইফ এর সাথে আলাপ করছি আর ভাবছি নিশ্চয়ই এতে শ্রষ্টার কোন মঙ্গালময় ইঙ্গিত আছে।

প্রকান্ড প্রকান্ড পাহাড়ের সুড়ঙ্গা রাস্তা ধরে বার বার ঘুরছি। কিন্তু রিয়াদের রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিনা। অবশেষে দেখলাম আমি মিনা, মুজদালেফা এবং পরে আরাফাতের কাছে পোঁছে গিয়ে কেবল রাস্তা প্রদক্ষিণ করছি। কিছুক্ষণের জন্যে থামলাম। রাত তখন সেই তায়েফের মতোই সাড়ে তিনটা। নিস্তব্দ নিরব ও জনশূণ্য এলাকা। কোন গাড়িও নজরে পড়ছে না যে কাউকে জিজ্ঞেস করবো। অগত্যা আবার ড্রাইভ করতে শুরু করলাম। দু'তিনটা সুড়ঙ্গা পথ পার হতেই দেখি কতগুলো পুলিশের গাড়ি। ভাবলাম তাদের কাছেই এবার রিয়াদের রাস্তা জেনে নেব। আমি গাড়ি নিয়ে যেখানে এসে পোঁছেছি, সেখানে রাস্তা শেষ। মানে নো থ্রো

রোড!! সম্বিত ফিরে পেলাম যখন দেখলাম আমাদের সামনে হারাম শরীফের ***বাব আল মালেক আবদুল আজীজ*** (বাদশা আবদুল আজীজ দরজা)। সাইফউদ্দিনকে বললাম- কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। যেহেতু আমরা ঘুরতে ঘুরতে মক্কা শরীফে চলে এসেছি। চলো হারামকে তওয়াফ করে ফজরের নামাজ পড়ে তারপরই রিয়াদের উদ্দেশে রওয়ানা হবো। এবার গাড়িটি পুলিশদের গাড়িগুলির পাশে রাস্তার উপরেই রেখে সোজা হারাম শরীফে চলে গেলাম। ফজর পড়েই তওয়াফ করলাম। এর পর হারাম শরীফের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা রিয়াদের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। না এবার আর রাস্তা ভুল হয়নি। হাজারো ক্লান্তি নিয়েও নিরাপদ ড্রাইভ করে বিকেল ৫টায় রিয়াদে পৌঁছি আমরা।

দুই

মক্কা থেকে ফেরার পর মাত্র সপ্তাহ দুয়েক পরেই আমার গাড়িটি রিয়াদের রওদা এলাকা হতে চুরি হয়ে যায়। গাড়িটি আমার এক আত্মীয় নিয়েছিলো তার '৯৬ মডেলের টয়োটা ক্যামরি আমার কাছে রেখে। সেদিন আত্মীয়টি আমার সেই নতুন গাড়িটি স্টার্ট পজিশানে রেখে (সময় রাত ১০-২০মিনিটে) মাত্র তিন মিটার দূরে একটি দোকানে ঢুকেছিলো একটি সপ্টড্রিংক নিতে। ফিরে এসে দেখে গাড়িটি যথাস্থানে নেই। মানে চুরি হয়ে গেছে। সে আমাকে ফোনে ঘটনা জানালে আমি ছুটে যাই সেখানে। না। কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এবার ছুটলাম সেই এলাকা মানে রওদা পুলিশ স্টেশনে। সেখানে গাড়ি চুরির কেইসটি ফাইল করি। পুলিশ বললো-এমন বোকামী করলে কেন? কেউ কি গাড়ি চালু অবস্থায় ফেলে দোকানে যায়? তোমরা করো ভুল আর আমাদেরকে তাক্‌লিফ্ দাও। গাড়িটি তুমি ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই পেয়ে যাবে। আমরা রিয়াদ থেকে বাহিরের সিটিগুলোতে যাওয়ার সমস্ত চেকপয়েন্টে খবর দিয়েছি। অতএব গাড়িটি নিয়ে সেই হারামী (চোর) রিয়াদের বাহিরে যেতে পারবে না। তবে কী অবস্থায় গাড়িটি পাবে তা আমরা বলতে পারবো না। পুলিশের এই শেষের কথাটি শোনে আমাশয় রোগীর মতোই তলপেটে একটি কামড় দিলো। কেন না আমি এমনি অনেক ঘটনা জানি, চুরি হয়ে যাওয়া অধিকাংশ গাড়ি মরুভূমিতে নিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে, বা গাড়ির কাচগুলো সব ভেঙ্গে ফেলে যায়। কোন কোন গাড়ির ইঞ্জিনের মেইন পার্টসগুলো খুলে নিয়ে যায়। যেহেতু আমার করার আর কিছুই নেই। তাই শুধু আল্লাহকেই স্মরণ করতে থাকলাম।

জুলাই ২০০৫ দ্বিতীয় সপ্তাহের ঘটনা। অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১০-২০মিঃ এ চুরি হয়ে যাওয়া গাড়ি প্রাপ্তির খবর আসে মানফুহা পুলিশের কাছ থেকে। গাড়িটি চুরির মাত্র দু'দিন পর। মানে বৃহস্পতিবার রাত ৩টায় ১০মিনিটে। মানফুহা পুলিশের ফোন পেয়ে সেই আত্মীয়টির সঙ্গে রাত তিনটা পনের মিনিটে ছুটলাম। থানার সামনে গিয়ে দেখি একটি পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। সে আমার নাম জিজ্ঞেস করলো। পরে বললো আমাকে ফলো করো। তার পেছনে পেছনে ড্রাইভ করে এগিয়ে যাচ্ছি। তখন মসজিদে মসজিদে ফজরের নামাজ শুরু হয়ে গেছে।

রিয়াদ মুল শহরের দক্ষিণে এটি একটি পুরাতন এলাকা। যেখানে রয়েছে সৌদির ঐতিহ্য এখনও বহু মাটির ঘর, ছোট ছোট গলি। অনেক অলি গলি পার হয়ে একটি ভাঙ্গা মাটির ঘরের কাছে এসে সামনের পুলিশের গাড়িটি থামলো। দেখলাম সেখানে সাধারণ পোশাকধারী কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু সামনে গিয়ে দেখি আমার গাড়িটির হেড লাইট জ্বালানো অবস্থায় ভাঙ্গা বাড়িটির দরজার সামনে পড়ে আছে। প্রথমেই চোখ ঘুরিয়ে দেখলাম, ভাঙ্গাচোড়া নয় গাড়িটি সতেজ অবস্থায়ই আছে। আবারও আল্লাহকে সীমাহীন ধন্যবাদ জানালাম।

আমার আত্মীয়ের গাড়ি থেকে নেমে এলাম। সেখানে দন্ডায়মান তিনজন শাদাপোশাকধারীদের সঙ্গে দেখলাম আমার ফলো করা পুলিশ অফিসার করমর্দন করছে। আমিও গিয়ে বুঝতে পারলাম এরা গোয়েন্দা পুলিশ। তাদের সঙ্গে আমিও হাত মেলালাম। তারা জানতে চাইলো আমি কোথায় চাকুরী করি। পরে

জানালো রাত ১২টায়ই তারা গাড়িটি এখানে এ অবস্থায় দেখতে পায়। তারপর তারা বিভিন্ন গোপন জায়গায় অবস্থান নিয়ে সারারাত কাটিয়েছে। কিন্তু হারামী (চোর) ধরতে পারেনি।

পুলিশ অফিসারটি আমাকে বললো– সাদিক মোতায়াচ্ছেপ (বন্ধু দুঃখিত) তোমার গাড়ির ভেতরে যে চাবি ছিলো তা এখন নেই মানে আমরা পাইনি। আর দেখো গাড়ির ভেতরে আর সব কিছু আছে কিনা। তোমার কাছে চাবি থাকলে ষ্টার্ট দাও। মনে মনে বললাম, ছালা যখন পেয়েছি, তখন তাতে আমও আছে। না পেলেও দুঃখ নেই। গাড়ি ষ্টার্ট দিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে পুলিশ অফিসারটি বললো– সাদিক ফি এনদাক সিগারা? (তোমার কাছে কি সিগারেট আছে?) আছে বলে যখন আমি তার দিকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরি হঠাৎ করেই সে বললো– মুতায়াচ্ছেপ (দুঃখিত) তোমার গাড়ির কেইসটি যেহেতু আমি দেখাশোনা করছি। এখন গাড়িটি তোমার হাতে তুলে দেয়া আমার দায়িত্ব। এ সময়ে তোমার কাছে সিগারেট নেয়া (আইব) অপরাধ হবে। পরে কখনো আবার দেখা হলে না হয় চা-সিগারেট সবই খাবো। দেখলাম সে পাশের সেই সিভিল পোশাকধারী লোকদের কাছে সিগারেট নিয়ে তা ধরালো। আমি বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি! পুলিশ অফিসারটি একটি কাগজে গাড়ি প্রাপ্তির একটি নোট লিখলো এবং আমাকে বললো তাতে সই করতে। মানে আমার গাড়ি আমি পেয়েছি এবং পুলিশের দায়িত্বে সে ঠিকভাবে পালন করেছে। আরবীতে সেখানে তাই লেখা আছে। কাগজে সই দিয়ে সে বললো– শোকরান (ধন্যবাদ) তোমার গাড়িটি ভালো অবস্থায় আমরা খুঁজে তোমার হাতে তুলে দিতে পেরেছি। আমিও তাকে ধন্যবাদ দিলাম।

পুলিশ অফিসারটি বললো, এবার তুমি তোমার গাড়ি নিয়ে চলে যেতে পারো। আর কোন ফরম্যালিটি নেই। আমার সেই নয়া মডেলের টয়োটা ক্যামরি জুনিয়র গাড়িটি যার মূল্য ৭৭হাজার ৯শত ৮৯সৌদি রিয়াল। (যা বেতন থেকে কিস্তিতে চার বছরে পরিশোধ যোগ্য) চুরি হয়ে যাওয়ার পর ফিরে পাওয়া পর্যন্ত একটি পয়সাও খরচ হয়নি। আমাদের দেশীয় এ্যানভায়রনমেন্টে এমনি একটি ঘটনা কী কল্পনা করা যায়? আমাদের দেশের পুলিশ এবং প্রশাসনকে এমনি দায়িত্বপরায়ণ কখনও আমরা কি দেখতে পাবো? আমরা কী তা আশা করতে পারি না???

রচনাকালঃ ২৪/৮/২০০৫ইং

দৈনিক যুগান্তর এ
১৭সেপ্টেম্বর২০০৫ইং ‘সৌদি গাড়িচোর ও ভালো পুলিশেরা’ শিরোনামে প্রকাশিত।

নেভার মাইন্ড

রিয়াদের মোরব্বা এলাকার একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে কর্মরত আমার এক মরিসাশের বন্ধু। যার কাছে সুযোগ পেলেই বিশেষ করে উইকইন্ডে গিয়ে কিছুটা সময় কাটাই। আমাদের সাপ্তাহিক দু'দিন (বৃহস্পতি ও শুক্রবার) ছুটি হলেও প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোতে মাত্র একদিনই ছুটি দেয়া হয়। আমার বন্ধুটির সুবাদেই সেখানকার ডাক্তার-নার্সদের সঙ্গো আমার একটি বন্ধুসুলভ পরিচয় গড়ে ওঠে। এক উইকইন্ডে সেই ক্লিনিকে গিয়ে দেখি বন্ধুটি একটি নবাগত হালকা পাতাল চটপটে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গো কথা বলছে। তার বয়স হবে হয়তো ১৮/২০। যদিও এই ফিলিপিনো জাতীয়তার মেয়ে-মহিলাদের বয়স বোঝা কঠিন। চল্লিশ বছরের মহিলাকেও মনে হবে ১৮/২০ বছরের মেয়ে। কেন না এরা সাইজে ছোট এবং নিজেদের সম্পর্কে খুবই সচেতন। মানে তারুণ্যকে এরা ধরে রাখতে জানে।

কীভাবে এখানে তাকে কাজ করতে হবে, নতুন এসেছে বিধায় নবাগতা ফিলিপিনা নার্স জোসেফিন ওরফে জোসিকে সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে আমার বন্ধুটি। সব নতুনদের জন্যেই এটা ওরিয়েনটেশান। এক ফাঁকে আমার সঙ্গোও তাকে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলো।

একদিন আমার বন্ধুটির সঙ্গো ক্লিনিকের নার্স ষ্টেশনে বসে আলাপ করছি। নবাগতা সেই জোসি এসে আমাকে দেখেই বললো- হাই, 'কামুস্তা পারে'? (তাদের তাগালো ভাষা) মানে কেমন আছো ভাই? উত্তরে- 'মাবুতে' বললাম। মানে ভালো আছি। জোসি একটি চেয়ার টেনে বসলো আমার সামনাসামনি হয়ে। আমাদের কথাবার্তার সঙ্গো সে ভাগ বসালো। কিছুক্ষণ পর সে বলে বসলো- 'সাদিক' (আরবী শব্দ মানে বন্ধু) আমাকে একটি পার-টাইম-জব জুটিয়ে দিতে পারো?
একটু অবাক হলাম। বললাম-তুমি এখানে নতুন। এখনও কিছুই চেনাজানা হয়ে ওঠেনা। আর 'ফিমেল' হয়ে এখানে তুমি কী পার-টাইম-জব করবে? 'মেইল'দের জন্যেইতো হাজারো যন্ত্রণা। তবে তোমার ক্লিনিকের ডিউটি শেষ করে তোমার কী তেমন এনার্জি থাকবে যে পার-টাইম-জব করবে? সে জানালো- আমার পুরো এনার্জিই থাকবে। জাষ্ট কাজটা দিয়েই দেখো না। আমি বললাম-তাহলে বোঝা যাচ্ছে তোমার অনেক 'পেসো' (ফিলিপিনো মুদ্রার নাম) প্রয়োজন। ...অফকোর্স.. একবছরের মধ্যেই আমাকে ত্রিশলাখ পেসো কামাতে হবে।

শোনে অবাক হয়ে বললাম- ও মাই গড়...ত্রিশলাখ? তোমার যে বেতন তাতে খেয়ে পড়ে যা থাকবে, তাতে বছরে মেক্সিমাম ৪/৫ লাখ পেসো হয়তো থাকতে পারে। আর বাকী ২৫লাখ কী মনে কর তুমি পার-টাইম-জব করে কামাতে পারবে? উত্তরে সে বললো-এ্যানি ওয়ে এন্ড এ্যানি হাউ মি নিড থার্টি হান্ড্রেড থাউজেন্টস। আই মিন্ আই মাস্ট টু আর্ন দ্যাট্ এমাউন্টস। তার কথায় আমার বিস্ময়ের আর অন্ত থাকলো না। একটু রসিকতার ছলে হেসে বললাম- তাহলেতো তোমাকে বাঁকা রাস্তা নিতে হবে। যে পথে স্বল্প সময়ে বহু কামানো যায়। তবে তাতে বিপদও পায়ে পায়ে। আমার এমনতরো কথায় সে বজ্জাত মেয়ে বললো-নেভার মাইন্ড! সাদিক। আমাদের মূলমন্ত্রই হচ্ছে- 'যতদিন বেঁচে আছো জীবনটাকে আচ্ছা করে ভোগ করো'। আর তা করতে গেলে কোন কিছুই মাইন্ড করা চলবে না। 'লাইফ ইজ ফর এ্যানজয়!!' এমন সিরিয়াস মেয়ের সঙ্গো আমি আর কথা বাড়ালাম না। সময়ের অপেক্ষায় থাকলাম। সময়ই সব বলে দেবে।

প্রায় ছয়-সাত মাস পরের কথা। সেদিন ছিলো বুধবার। আমাদের ওয়ার্কিং ডে'র শেষ দিন। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ডিউটি। বেলা একটায় মানে লাঞ্চ ব্রেকে বন্ধুটির একটি ফোন পেলাম। সে জানালো-যদি

একটি বিশেষ মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে চাও, তাহলে বেলা দু'টার মধ্যে আমাদের ক্লিনিকে চলে এসো। কেননা তাকে আজই দেশে পাঠানো হচ্ছে ফাইন্যাল এক্সিটে। তোমারতো আবার লেখালেখির বাতিক আছে। তাই তোমার ইহা জানা খুবই দরকার।
বন্ধুটিকে জানালাম- দোস্ত ডিউটি শেষ করার আগে অফিস থেকে নামতে পারছিনা। বুধবার তো। কোন কাজ পেন্ডিং রাখা যাবে না.....।

ভাবছি আর গাড়ি ড্রাইভ করছি। বন্ধুটি কোন মেয়ের কথা বললো ভেবে পাচ্ছিনা। আবার সে বলেছিলো তাতে আমার জন্যে নাকি বিশেষ সারফ্রাইজও আছে। অবশেষে তাদের ক্লিনিকে পৌঁছে যাকে দেখলাম, তাতে আমারতো রীতিমতো ভিরমি খাবার উপক্রম। জানলাম সেই জোসিই বর্তমানে কুমারী মাতা হতে যাচ্ছে। তার এই অপকর্মের জন্যে ক্লিনিকের মান রক্ষার্থে মালিক তাকে ফাইন্যাল এক্সিট এ দেশে পাঠাচ্ছে। বন্ধুর মুখে কাহিনী শুনেই আমি মুক হয়ে গিয়েছি। আমার সমস্ত ভাষার পাখিরা মনে হলো যেন আমার মধ্য থেকে উড়ে পালিয়েছে। তাই আর ইচ্ছে হলো না সেই জোসির সঙ্গে কোন কথা বলতে। কিন্তু জোসিকে দেখে মনে হলো না যে সে এতে বিন্দুমাত্র ভীত এবং বিমর্ষ। হয়তো বা সে এটাকেও 'নেবার মাইন্ড' ধরে নিয়েছে এবং তার টার্গেট পুরা করেছে। এদেশে প্রায় দেড় মিলিয়ন ফিলিপিনো-ফিলিপিনা কর্মরত। তাদের ক'জনের খবরই বা আমি জানি। এ সংখ্যার প্রায় ৬৫ভাগই মহিলা কর্মী। ডোমেস্টিক হেল্পার থেকে শুরু করে ক্লিনিক, হাসপাতাল সর্বত্রই তাদের সাম্রাজ্য।

এক কার- ওয়ার্কসপে আসা যাওয়াতে সেখানে কর্মরত একজন ফিলিপিনো কার-মেকানিক রোলান্ড এর সঙ্গে পরিচয়। অনেক কথার ফাঁকে ফাঁকে সে তাদের দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা বেশ গর্বের সঙ্গে প্রকাশ করে। সে জানালো তাদের দেশের কেউই দেশে থাকতে চায় না। তারা সবাই দেশের বাহিরে গিয়ে 'ডলার আর্ন' করতে চায়, স্বাবলম্বী হতে চায়। তারা কারো উপর বার্ডেন হয়ে বাঁচতে চায় না। একদিন দেখলাম তাকে বেশ খুশি খুশি ফুরফুরে ভাব।
-কী ব্যাপার রোলান্ড আজকে তোমাকে বেশ খুশি মনে হচ্ছে। নতুন কোন তাজা খবর আছে?
সে আগেই বলেছিলো তার বউ সিরিয়াস সুন্দরী। এবং ছবিও দেখিয়েছে। সে নাকি দুই বাচচা রেখে তাদের দেশেরই এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে গত তিন বছর আগে আমেরিকা চলে গিয়েছিলো। এক সপ্তাহ হলো তার বউ প্রচুর ডলার নিয়ে দেশে ফিরে এসেছে। তাই সেও দেশে যাবে কয়েকদিনের মধ্যেই। তাই তার আনন্দ উপচে পড়ছে।
তাকে জিজ্ঞেস করলাম- রোলান্ড এমন বউকে কী তুমি আবার গ্রহণ করবে?
-হোয়াই নট?! ডলার ইজ গড, ডলার ইজ লাইফ! সো- অলরেডি সি হ্যাভ ইটস
আবার বললাম তুমি না বলেছিলে, সে তোমার বাচ্চাদের ফেলে এমনকি তোমাকেও না জানিয়ে অন্যের সঙ্গে আমেরিকা চলেগিয়েছিলো? তারপরও..?
সে এবার মাথা শরীরসমেত ঝাঁকিয়ে বলে উঠলো- 'নেভার মাইন্ড'।।

প্রথম প্রকাশঃ সাপ্তাহিক সন্দীপ / সাপ্তাহিক আকর্ষণ, ১৭ নভেম্বর ১৯৯২ইং

সউদী আরবে শাওনের বৃষ্টি

মরুভূমির দেশ সউদী আরব। বিশেষতঃ রাজধানী রিয়াদ। কিন্তু এখন আবহাওয়ায় আসিয়াছে অনেক পরিবর্তন। প্রচুর যত্ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে মরুর বুকে গাছপালার সমারোহ এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ। বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যায় সউদী সরকার খুবই আন্তরিক। দূর-দূরান্ত হইতে মাটি ও চারা আনিয়া রিয়াদের সর্বত্র গাছ লাগানো হইয়াছে। চারা ও গাছ বাঁচাইয়া রাখার জন্য সকাল-সন্ধ্যা অনবরত পানি ঢালা হইতেছে। ফলে মরুর বুকের এই শহরটি দিনে দিনে সবুজ হইতে সবুজতর হইয়া উঠিতেছে। অবশ্য খরচ হইতেছে মিলিয়ন মিলিয়ন সউদী রিয়াল।
ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। শাওনের বর্ষণ বাংলার গাঁও-গেরামে টিনের চালে রিমঝিম সুর তোলে। বৃষ্টি ভেজা কাক-চিল বট বৃক্ষের মগডালে বসিয়া ডাকে। এখানে তাহা শোনার উপায় নাই। টিন সম্ভবতঃ তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলিরই শোভা। এখানে টিনের কারবার নাই। ইট-পাথরে গড়া লেটেস্ট প্রযুক্তির সব ইমারত। তাই বৃষ্টিতে টিনের ঘরের মত বেহালার সুর মূর্ছনা এখানে অনুপস্থিত। তবে অনুভবে ধরা পড়ে।

আবহাওয়ার পরিবর্তনে গাছ-গাছলার টানে এখন এই মরুভূমির দেশেও বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি নামে গগন জুড়িয়া শাওন বাংলার মত। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে আকাশ থাকে মেঘাচ্ছন্ন, কখনও ঝির ঝির ধারা নামে, কখনও মুষল ধারায় বৃষ্টি। তখন গ্রাম-বাংলার শাওন মাসের কথাই বড় মনে পড়ে। কখনও কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া যায়। শিলাবৃষ্টিও হয় মাঝে মাঝে। বৃষ্টিতে এই দেশে শীত বাড়ে, একেবারে হাঁড় কাঁপানো শীত। তখন রুম হিটার ছাড়া থাকাই অসম্ভব। কিন্তু এবার এত বৃষ্টি হইল যে, শীত না বাড়িয়া লেজ গুটাইয়া পলায়ন করিয়াছে। বৃষ্টিতে এখানকার লোকেরা খুব খুশী হয়। সউদী 'টিনেজরা' বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাদায় লুটোপুটি খায়। কেউ কেউ আবার বৃষ্টিতে বলও খেলে। সাথে বয়স্করাও যোগ দেয়। তাহারা বলেনঃ 'মাতর রাহ্মা রাব্বুনা', মানে বৃষ্টি আল্লাহ্র রহমত।

প্রথম প্রকাশঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪এপ্রিল, ১৯৯২ইং

আদর প্রিয় নায়না

'নায়না' শ্রীলংকার মেয়ে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নায়না ডোমেস্টিক হেল্পার হয়ে এসেছে এদেশে। কাজ করে আমাদের হাসপাতালের এক কানাডীয় ডাক্তারের বাসায়। ভদ্রলোক মুলতঃ ভূমধ্যসাগরীয় দেশ লেবাননের বংশোদ্ভূত। এ ডাক্তারের সঙ্গে আমার একটি মিষ্টি সম্পর্ক আছে। তার ছেলে-মেয়েরাও আমাকে আম্মি (চাচা) বলে ডাকে। এরা পরিবারের সবাই অত্যন্ত মুখর এবং দিলখোলা। যাকে বলা চলে 'ফ্রি এন্ড ফ্র্যাঙ্ক'। বিশেষ করে বিদেশে ডাক্তার শ্রেণীর সঙ্গে সবাই একটি আন্তরিক সম্পর্ক রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। কেননা এদেরকেই সবচে' বেশী দরকার হয় বিপদে-আপদে, সময়ে এবং অসময়ে...। আমারও তাই। আর সে সুবাদেই নায়নার সঙ্গে পরিচয়।

মেয়েটি তাদের সিংহলী ভাষা এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবী ছাড়া আর কোন ভাষাই জানে না। তবে অবস্থাদৃষ্টে বোঝা গেলো কানাডীয় ডাক্তার ইউসেফ রাহবানীর বাসায় কাজ করতে এবং তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভাষা বিনিময়ে নায়নার কোন সমস্যা হয় না। কেননা সেই পরিবারের সবাই আরবী জানে।

একদিন নায়নাকে জিজ্ঞেস করলাম-আচ্ছা নায়না তুমি এদেশে এসেছো মাত্র কয়েকমাস। এত আরবী শিখলে কীভাবে?

-আমি কুয়েত এবং বাহরাইনে মোট চার বছর এমনি কাজ করে এসেছি। তাই আমার আরবী বুঝতে এবং বলতে কোন কষ্ট হয় না।

আমি জানতে চাইলাম নায়নার কাছে-আমি তো কখনও কুয়েত যাইনি। সে দেশটি এবং সেখানকার লোকগুলো কেমন একটু বলবে কি?

সে জানালো-দেশটি তো স্বর্গের মতো। লোকগুলো যেন দেবতা।

-নায়না আমার মনে হয় তুমি একটু বাড়িয়ে বলছো। অথচ আমি শুনেছি ওরা আরাম এবং আমোদ প্রিয়। বিদেশী মেয়েদের ঘরের কাজে এনে ওদের সঙ্গে যাচ্ছে-তাই ব্যবহার করে। পত্র-পত্রিকায়তো মাঝে-মধ্যে এমন খবরই পাই।

-তাদের পয়সা আছে, তারা যা ই করুক না কেন, আসলেই তারা খুব ভালো লোক। আমাকে খুব আদর করতো। আমার বিভিন্ন খরচের জন্যে বেতনের পয়সায় হাত দিতে হতো না। আমি যে বাসায় থাকতাম তাদের আত্মীয়রা এলেও তারা আমাকে আদর করতো এবং পয়সা দিতো। আর বাহরাইনে আমি যে বুড়ির বাসায় কাজ করতাম, তার সেয়ানা সেয়ানা ছেলেরা আমাকে আদর করতো ঠিকই কিন্তু কোন পয়সা দিতো না। তাই সেখানে আমার বেতনের বাহিরে কোন পয়সাই দেখতাম না।

নায়নার আদর প্রিয়তার বর্ণনা শোনে আমি বেশ কিছুক্ষণ মুখ চেপে হাসলাম।

এবার আমি নায়নাকে একটু চমকে দেবার জন্য বললাম-তোমার স্বামী পরিচয়ে শ্রীলংকা থেকে যে ড্রাইভার এনেছো ডাক্তার রাহবানীর জন্যে। আমি তো জেনেছি সে তোমার স্বামী নয়।

- হঠাৎ সে চমকে উঠে বললো, কে বলেছে তোমাকে এমন কথা?

-তোমাদের এলাকারই একজন শ্রীলংকান ড্রাইভার বললো। আমি কিন্তু তোমার বস্‌কে বিষয়টি জানিয়ে দেবো।

নায়না এদিক-সেদিক তাকিয়ে আকুতি ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো- দোহাই তোমার আমার পেটে লাথি দেবে না। তাহলে আমাদের দু'জনেরই মহাবিপদ হবে। ছেলেটি খুব ভালো। আমি বিয়ের জন্যে পছন্দ করেই

তাকে এখানে ভিসা দিয়ে এনেছি। সে আমাকে খুব আদর করে। সে বলেছে আমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। সামনের ছুটিতে গিয়েই বিয়ে সমাধান করবে বলে সে প্রতিজ্ঞা করেছে।

আমি হতবাক হয়ে তার দিকে তাকাই। আমি মূক হয়ে যাই মুহূর্তের জন্য। আমার একটি সাজানো এবং বানোয়াট কথায় সে এমনি বিচলিত হবে। এবং সত্যি সত্যি গর্তের সাপ এমনিভাবে বেরিয়ে আসবে। যা ছিলো আমার কল্পনাতীত।
– ওকে যদি বিয়েই না হয়, তবে একই ঘরে ঘুমাও কেন? তোমাদের ধর্মে কি এটা বৈধ?
–জানেন ছেলেটা খুব ভালো। দেশে কেউতো বিয়ে করতে চায় না আমি বিদেশে থাকি বলে। জাষ্ট সবাই চায় 'টাইম পাচ্' করতে। তার চাইতে তো এ শতগুনে ভালো। সবচে' বড় কথা আমি কারো আদর ছাড়া ঘুমাতে পারি না। আদর ছাড়া আমি পাগল হয়ে যাই। এবার বলুনতো আমাদের এমন গোপন কথাটি কোন ড্রাইভার বলেছে। ঐ সেই 'পেরেরা' নাকি তার ছেলে? তারা বাপ-বেটা দু'জনইতো এখানে ড্রাইভার। আমাদের পার্শ্ববর্তী জেলার লোক। খুবই হিংসুটে লোক।

বললাম - কে বলেছে সে কথা আর শোনে কাজ নেই। যে ই বলেছে আমি তাকে বারণ করে দেবো, যাতে তোমার বসকে এসব না জানায়। আমিও বলতে যাচ্ছি না এমন কথা তোমার বসকে। তবে তুমি কিন্তু সাবধান হও! তুমি এখনো টের পাওনি এসব আদরের ফলাফল কি হতে পারে। টের পেলে বহু আগেই এই আদরপ্রিয়তা জন্মের মতো ভুলে যেতে।

একদিন মিসেস রাহবানী জানালেন, তাদের শ্রীলংকান ড্রাইভারটি নাকি তার বউ নিয়ে মানে সেই কাজের মেয়ে নায়নাকে নিয়ে রাত বারোটার পর কোথায় চলে যায়, ফিরে সেই কাকডাকা ভোরে। বিশেষ করে তিনি ইহা উইকইন্ডেই লক্ষ্য করেছেন। মিসেস রাহবানী তাদের একদিন নাকি ধরেও ফেলেছেন। দেশে পাঠিয়ে দেবার ধমকি দিলে নাকি তারা অনেক কান্নাকাটি করে আকুতি-মিনতি করেছে। যার জন্য তিনি তাদের মাফ করে দিয়েছেন।
মিসেস রাহবানীর কথা শোনে আমার মনে হয়েছে কুয়েত এবং বাহরাইন খেয়ে আসা এই নায়না ড্রাইভারকে নিয়ে অন্য কোথাও আদরের জন্যেই সে গমন করে। কেন না আদরের ঘাটতি পড়লে 'নায়না' দিশেহারা হয়ে পড়ে।

প্রথম প্রকাশঃ সন্দ্বীপ / সাপ্তাহিক আকর্ষণ, ০৩-১১-১৯৯২

'রিয়্যালী সি হেভ মিরাক্যাল পাওয়ার'

বিমানে বসে মিনিট দশেক হবে হয়তো আমাদের আলাপ পরিচয় পর্ব শেষ হয়েছে। হঠাৎ করেই ভদ্রমহিলা বলতে শুরু করলেন- তোমাদের বাংলাদেশ একটি আজব এবং মজার দেশ। সেখানে যেমন লেগে থাকে বন্যা-খরা-বৃষ্টি-বাদল এবং ঘূর্ণিঝড় আবার তেমনি লেগে থাকে বিপজ্জনক রাজনীতির ঝড়। তোমাদের দেশের অধিকাংশ রাজনীতিবিদগন জনগনের জন্যে, দেশের জন্যে রাজনীতি করেননি, তা আমি তীব্রভাবে উপলব্দি করেছি। তা না হলে দেশটির এ অবস্থা থাকবে কেন? 'ইউ নউ' প্রতি বছরই আমি তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ নিয়ে পড়াশোনা করি। সে দেশ, দেশের জনগন, তাদের অর্থনীতি, সমাজনীতি,আচার-আচরণ,কালচার, হেরিটেজ, সবকিছুই জানার চেষ্টা করি। আমার এ বছরের ষ্টাডির দেশ বাঙলাদেশ। তোমাকে পেয়ে তাই অনেকগুলো কথা বলে ফেললাম। প্লিজ ডন্ট মাইন্ড!!

ফ্রান্সের মহিলা। এসেছিলেন রিয়াদে কর্মরত স্বামীর কাছে। মহিলা পেশায় স্কুল শিক্ষিকা। বিশদিনের ছুটি কাটায়ে দেশে ফিরছেন। ডাইরেক্ট ফ্লাইট না থাকাতে রিয়াদ থেকে দাহরান হয়ে ফ্রান্সে যাচ্ছেন। পুরো বিমানে মাত্র ত্রিশ-পয়ত্রিশ জন যাত্রী। প্রায় সিটই খালি। তাই তিনি এসে আমার পাশের সিটে বসার জন্যে বললে সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতি দিলাম। বসেই ফ্রান্স ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন। বললাম- দুঃখিত আমার সঙ্গে ইংরেজীতে হলেই জমবে ভালো। কেননা তোমাদের ভাষাটি আমার রপ্ত নয়। স্বল্প সময়ের পরিচয়ে সে কথার খই ফুটিয়ে যাচ্ছে। আমিও বেশ উপভোগ করছি। বোঝা গেল ভদ্রমহিলা বেশ মুখরা স্বভাবের।

জানতে চাইলাম তার সংসারে আর কে কে আছে। সে জানালো- দুই মেয়ে। ওরা দু'জনেই কলেজে পড়ছে।
বললাম- ওদের নিয়ে এলে না কেন?
-ওরা পছন্দ করে না এমন দূরের ভ্রমন।
বললাম- এখানে স্বামীর কাছে স্থায়ীভাবে থাকছো না কেন?
-আমার প্যারিসের সেই স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে এখানে থাকবো এমনটি কখনো ভাবিনি। চাকরি ছেড়ে এদেশে স্বামীর সঙ্গে থাকতে গেলে তো স্বাবলম্বী চেতনার অপমৃত্যু ঘটবে। আমি তা পছন্দ করি না।
এরই মাঝে একজন সুন্দরী বিমানবালা এসে আমাদের দু'জনের হাতে দু'গ্লাস জুস দিয়ে গেল। জুস খেতে খেতে আমাদের আলাপ এগিয়ে চললো। আর আমাদের বিমানটিও বাতাসের সমুদ্রে সাঁতরিয়ে এগিয়ে চলছে দাহরানের উদ্দেশে।

ভদ্রমহিলা আবার বলতে শুরু করলো- তোমাদের বাংলাদেশ একটি আজব এবং মজার দেশ। সেখানে যেমন লেগে থাকে বন্যা-খরা-বৃষ্টি-বাদল এবং ঘূর্ণিঝড় আবার তেমনি লেগে থাকে বিপজ্জনক রাজনীতির ঝড়। তোমাদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থানটি আমি নিজ চোখে না দেখলেও বই-পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকাতে পড়ে মনে একটি চিত্র অঙ্কন করেছি। আর তাতে একটি চমৎকার বিষয় বেরিয়ে এলো। তা হলো, তোমাদের দেশ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। ষড়ঋতুর দেশ। সেখানকার লোকজন আবেগপ্রিয় তাই সাহিত্য বেশী পছন্দ করে। এর সঙ্গে অনেকেই রাজনীতির মূল সংজ্ঞা না বোঝলেও তারা রাজনীতি করতেও পছন্দ করে। কী বলো ঠিক বলিনি?
বললাম, তুমি দেখছি আমাদের দেশ-জাতি সম্পর্কে বেশ ভালো খোঁজ-খবরই রাখো।

–আরে শুধু কি তাই, বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশ সম্পর্কেই আমার ভালো ধারণা আছে। 'ইউ নউ' প্রতি বছরই আমি তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ নিয়ে পড়াশোনা করি। সে দেশ, দেশের জনগন, তাদের অর্থনীতি, সমাজনীতি,আচার–আচরণ,কালচার, হেরিটেজ, সবকিছুই জানার চেষ্টা করি। আমার এ বছরের ষ্টাডির দেশ বাঙলাদেশ। তোমাকে পেয়ে তাই অনেকগুলো কথা বলে ফেললাম। প্লিজ ডন্ট মাইন্ড!! আমার ভাবতে অবাক লাগে, কীভাবে তোমরা মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে পাকিস্তান থেকে নিজেদের দেশটিকে স্বাধীন করলে?!! ইটস সো ওয়ান্ডারফুল!

–আমরা লড়াকু জাতি। দেশের জন্যে রক্ত দিতে দ্বিধা করিনি। '৭১এর স্বাধীনতাই আমাদের বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ট অর্জন। সে অর্জনই আমাদের অহংকার। এবং অহংকার করি আমাদের নিজস্ব ভাষা–সংস্কৃতি নিয়েও। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, আমাদের বাংলা ভাষা এখন পৃথিবীর চতুর্থতম ভাষা।

– ইয়া আই নউ। কিন্তু একটি কথা না বললেই নয়। ইদানীংকালে তোমাদের দেশে একই টাইমে সারাদেশে বোমা ফাঁটালো কারা? ওরা কি আল কায়েদা?

বললাম– না। আল কায়েদা আমাদের দেশে নেই। ওরা স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি। যারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা মেনে নিতে পারেনি। সেই পরাজিত শক্তিগুলোই এমনটি ঘটিয়েছে।

– তাতে কিন্তু বিশ্বে তোমাদের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে।

– হ্যা তা হয়েছে।

– আমরা প্রায় দাহরান চলে এসেছি। একটি কথা তোমার কাছে জানতে চাইবো। তোমাদের দেশের একজন বিখ্যাত লেখিকা তাসলিমা নাসরিন। তার বেশ কয়েকটি বই (যা ফ্রান্স ভাষায় অনূদিত) পড়ে বেশ মজা পেয়েছি। মহিলা তো তার লেখায় চরম সত্যকে সৎ সাহসের সঙ্গেই উচ্চারণ করেছে। তোমরা তার বিরুদ্ধাচারণ করছো কেন? কেনই বা তাকে দেশে থাকতে দাওনি। আমিতো মনে করি সে তোমাদের দেশের এক বিরাট সম্পদ। তুমি কি জানো যে সে এবার নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্যে মনোনিত হয়েছে?

– হ্যা জানি।

– তো সে নোবেল পুরস্কারটি পেয়ে গেলে তোমরা কি তাকে স্বাদরে নিজ দেশে ডেকে নেবে? নিজেরা কি অহংকারের সহিত বলবে যে, তাসলিমা নাসরিন বাংলাদেশের সন্তান, বাঙালি?

–তুমি আমাকে এক সীমাহীন কঠিন প্রশ্ন করেছো। যা আমার মতো চুনোপুটির পক্ষে উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। এর উত্তর পেতে আমাকে অগ্রজদের উত্তরের অপেক্ষা করতে হবে।

–হোয়াই নট?!! আমিতো তোমাদের সেই তাসলিমা নাসরিনের মাঝে এক অন্তবিহীন দেশপ্রেম দেখেছি তার সৃষ্টিতে। যে দেশপ্রেম না থাকলে একজন লেখক সমাজের এত গভীরে প্রবেশ করতে পারতো না। 'রিয়্যালী সি হেভ মিরাক্যাল পাওয়ার'।

ঘোষণা এসে গেল সিটবেল্ট বাঁধার জন্যে। মানে আমরা ৫৫মিনিটের আকাশ ভ্রমনে সৌদি আরবের পুর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ দাহরান ইন্টান্যাশনাল এয়ারপোর্টে অবতরণ করতে যাচ্ছি। অফিসিয়্যাল কাজে যদি আজ আমি ইষ্টার্ণ প্রভিন্সে না আসতাম। তা হলে হয়তো এমন একজন মহিলার সঙ্গে আমি কোনদিনই পরিচিত হতে পারতাম না। জানতে পারতাম না একজন বিদেশীনির মুখে আমাদের জাতি সম্পর্কে এমন টক–ঝাল–মিষ্টি মতামত। এয়ারপোর্টে নেমে তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সে জানালো বিমানে আমাদের সময়টি দারুণ কেটেছে। তোমাকে অনেকদিন মনে থাকবে। থ্যাঙ্কস্, হ্যাভ এ লাভলী টাইম।

১৩সেপ্টেম্বর ২০০৫ইং

রিয়াদে বাঙালি কমিউনিটির বাংলা স্কুলের পর্ষদ নির্বাচন-২০০৫

যুগান্তর পরবাস সমাবেশ, রিয়াদ এর সিংহভাগ সম্মানিত সদস্যই এখানকার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ বাংলা শাখার সম্মানিত অভিভাবক। তাই তাদের বাচ্চাদের স্কুল পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনে তারা ছিলো বেশ টান টান উত্তেজনায়। দীর্ঘকাল পর এ স্কুলে পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন হলো ২০শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার। যা ছিলো অত্র স্কুলের ৬০০ (ছয়শত) গার্ডিয়ানের দীর্ঘকালের প্রত্যাশা। দীর্ঘকাল ধরে অনির্বাচিত স্কুল পর্ষদের অনেক অনিয়ম নিরীহ গার্ডিয়ানের মাথার উপর এক জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিলো। যাকে সরানোর এক বিশেষ ভূমিকা রাখে মরুপলাশ ডট কম এর লেখালেখিতে। তবে এর জন্য মরুপলাশকে স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক অনেক যন্ত্রণা ভোগতে হয়েছে। তবে সে লেখালেখির ফসল ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর সাহেদা ওবায়েদ রিয়াদের স্কুলটিতে ভিজিট করেছেন। অবশেষে এখানে স্কুল পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনের মতো একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে ওঠে। যা অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো গত ২০অক্টোবর'০৫ এ।

এখানে ৫জন করে দু'টি প্যানেল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এবার। স্কুল পরিচালনা পর্ষদের পদগুলো হলো- চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সিগনেটরী, এবং দু'জন সম্মানিত পর্ষদ সদস্য। এরাই হবেন স্কুলের ছয়শত গার্ডিয়ানের প্রতিনিধি। যারা স্কুলটিকে পরিচালনা করবেন। সাধারণ গার্ডিয়ানগন এবারের নির্বাচনে যাদের যোগ্য ভেবেছেন তাদেরই নির্বাচিত করেছেন। এতে আমরা সকল অভিভাবক ভাইদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দৈনিক যুগান্তর পরিবার এর পরবাস সমাবেশ, রিয়াদ এর পক্ষ থেকে নবাগত পর্ষদকেও স্বাগতঃ জানাই।

সাধারণ গার্ডিয়ানগন আমাদের পরবাস সমাবেশকে তাদের দীর্ঘদিনের কিছু প্রত্যাশার কথা জানিয়েছে। তাদের দাবী স্কুলটিকে একটি নিজস্ব জমিনে স্থাপিত করা হোক। বাচ্চাদের স্কুল টিউশান ফি যেন কিছু কমানো হয়। তাদের বহুদিনের দাবী স্কুলে যেন সহসাই বাধ্যতামূলক কম্পিউটার সায়েন্স খোলার পদক্ষেপ নেয় হয়। অধিকাংশ গার্ডিয়ানগন হচ্ছেন ফিক্স ইনকাম গ্রুপের লোক। মানে চাকুরীজীবি। বহুকষ্টে অর্জিত তাদের বৈদেশিক মুদ্রার যেন অপচয় না হয়। বাচচারা যেন সঠিক, সুন্দর এবং পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পেয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে। স্কুল থেকে বেরিয়েই যাতে তাদের এবং তাদের পিতামাতাকে ভাবতে বাধ্য না করে যে, বাচ্চাদের প্রাইভেট টিউশান জরুরী।

এবারের নির্বাচনে যোগ্য লোকজনই নির্বাচিত হয়েছেন বলে সাধারণ গার্ডিয়ানগন তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যাদের সারিতে প্রথমেই রয়েছেন প্রকৌশলী জনাব আবুল ফারুক মুহাম্মদ সালেহ সিদ্দিকী, (যিনি চাঁদপুরের ইঞ্জিনিয়ার সালেহ সিদ্দিকী নামে সুপরিচিত) জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, জনাব মোহাম্মদ মুহিবুর রহমান, জনাব মোহাঃ নুরুল ইসলাম, জনাব মাহবুবুর রহমান।

এ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এখানকার বাংলাদেশ দুতাবাস এবং সউদী মিনিষ্ট্রি অব এডুকেশন। এই নির্বাচনকে ঘিরে রিয়াদে ছিলো সাজ সাজ রব। কেননা আমরা প্রবাসীরা দেশের কোন নির্বাচনে অংশ নিতে পারিনি। বিদেশে আমাদের বাচ্চাদের স্কুল পর্ষদ নির্বাচনে যার জন্যে অভিভাবকদের মাঝে এমন আগ্রহ এবং আনন্দ মূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। বলা যায় বিদেশে এই স্কুল নির্বাচনে আমরা দুধের স্বাধ যেন ঘোলে মেটালাম। অবশেষে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছেন সত্যিকার অর্থেই যারা স্কুলকে বিনাস্বার্থে নিজেদের মেধা-শ্রম-সময় দিয়ে আন্তর্জাতিকমানের একটি স্কুল গড়ে তুলতে চান।

তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে এমনি কিছু সুন্দর কথামালা প্রচারিত হয়েছে। তাদের চলার পথ কন্টকাকীর্ণ না হয়ে কুসুমাস্তীর্ণ হোক। তাদের সহযোগীতার জন্যে যুগান্তর পরিবারের পরবাস সমাবেশ, রিয়াদ উদার চিত্তে সবসময়ই এগিয়ে যেতে প্রস্তুত।

দৈনিক যুগান্তর এ প্রকাশিত
নভেম্বর২০০৬ইং

রিয়াদের বাঙালি কমিউনিটিতে ইপ্তার মাহফিলও ঈদ পুনর্মিলন

পুরোটি বছর বিদেশে আমরা একে অন্যের থেকে বেশ দূরে থাকলেও রমজান মাসটি আমাদের জন্য সম্প্রীতির মাস হিসেবেই দেখা দেয়। বিদেশে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করি ইপ্তার পার্টির মাধ্যমে বিদেশে আমাদের পরস্পরের দূরত্বটা একটু কমিয়ে আনতে। এটা অত্যন্ত শুভ লক্ষ্যন আমাদের মানসিকতার জন্য। এখানকার প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল বিশেষ করে আওয়ামী পরিবারের বিভিন্ন সংগঠন, বিএনপির বিভিন্ন অংগ সংগঠন, সিলেট গনদাবী পরিষদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর মত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো সারা মাস ধরেই ইপ্তার পার্টির আয়োজন করেছে। ঈদে আয়োজিত হয়েছে ঈদ পুনর্মিলন। এখানে কেউ কেউতো রীতিমতো চাঁদা তুলে ফাইভ ষ্টার হোটেলে গিয়ে আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠেছেন। নিজেদের আবেগ প্রকাশ করেছেন।

এই সব দেখে শোনে আমিতো আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ যদি আরো দু'চারটি মাস এমনি রমজান দিতেন তাহলে আমরা সে সুবাদে বিদেশে সম্প্রীতির বন্ধনে আরো কিছুকাল আবদ্ধ থাকতে পারতাম।

যুগান্তর পরবাস সমাবেশ এর ফ্রান্স, জার্মান, ইটালী, জাপান সহ অন্যান্য দেশেও যে সকল প্রবাসী বাঙালি ভাইয়েরা এই পরবাস সমাবেশ গঠন করেছেন এবং সউদী আরবের দাম্মাম, ইয়ানবো, আলগাছিম, আল মদিনা, মক্কা, জেদ্দা, খামিস মোসায়েত, সাকাকা, গুরাইয়াত, তায়েফ, তাবুক এর সকল শাখা কমিটির সদস্য ভাইদের ঈদোত্তর শুভেচ্ছা দিচ্ছি। সবারই প্রবাস সুন্দর-স্বাবলীল ও সফলতার সোনা দানায় ভরে উঠুক।

খবর.কম

হতাশার অন্ধকারেও আলোকিত সংবাদ

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, রিয়াদ এর ৫২ জন ছাত্রছাত্রীকে মরুপলাশ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন, যারা এবার এস এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

রোল ৯৫০০৫১ হইতে রোল ৯৫০১০২ পর্যন্ত মোট ৫২ জন ছাত্রছাত্রী এবারের এস এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অত্র স্কুল হতে সবাই পাশ করেছে। পাশের হার শতকরা একশ' ভাগ।

এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩জন। তারা হলো- আবদুল মুহিদ, আবুল বাশার, আয়েশা আক্তার, সুমাইয়া উদ্দিন, ইমেরাল উপমা বৈদ্য, সোমা আহমেদ, তাসলিমা সুলতানা লিমা, জাবির মোঃ সালেহ্, মোঃ খালিদ খান, আবদুল আহাদ, মোঃ সোলাইমান খান এবং শেখ ইমরান আলম, ফাহমি বিন মালেক।

জিপিএ ৪ - ৪.৯৪ পেয়ে পাশ করেছে মোট ৩০জন। তারা হলো- শারমিন মনোয়ার, আহমেদ সাইদ, মোঃ মাহফুজ হোসাইন, জানিজ হোমাইরা, ফাতেমা বেগম, রেহনোমা মাহজাবিন চৌঃ. সুমাইয়া আক্তার সাদিয়া, নুসরাত শারমিন, জিনাত সুলতানা, রেহেনা আক্তার, শারমিন হোসাইন, সালমা পারভিন তানিয়া, রফিকুল ইসলাম, মালিহা ওয়ারদা, হোমাইরা আবদুল হান্নান, মরিয়ম হোসেন, সোমাইয়া জার্ফারিন চৌঃ, নাজমুল ইসলাম, মাহিদুর রহমান খান, আবদুল আজিজ, শামীম উদ্দিন, শফিকুল আলম চৌঃ, এইচ, এম, রাশেখ খান, মোঃ ইকবাল, মোঃ মিজানুর রশিদ, আহমেদ সাইদ, নিপা মোনালিসা, লাকী আক্তার, সুলতানা ফরিদা চৌঃ এবং তানভীর সিদ্দিকী।

জিপিএ ৩.৫ - ৩.৮৮ পেয়ে পাশ করেছে ৯জন ছাত্রছাত্রী। এরা হলো- মেহেদী হোসাইন সরকার, সোমাইয়া খোয়াজ, আবদুল আজিজ, মোঃ জুয়েল, ফাহমিদা ফারহানা নুর, ফাহমিদা হক, কামরুজ্জামান সৌরভ, আয়মন মোসলেহ, জবির আলম চৌঃ।

বিদেশে বিশেষ করে এই মক্কা-মদীনার দেশে বেড়ে উঠা আমাদের এই প্রজন্মের সম্পর্ক শুধুমাত্র বইয়ের সঙ্গে। যারা মুক্ত পাখির মতো উড়ে বেড়াতে পারে না। সে সুযোগও নেই এখানে। বিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধাও নেই তাদের। যারা দ্বাদশ শ্রেণী অতিক্রম করেও বাস্তবে শিশুই রয়ে যায়। সেই তারাই ঢাকার কোন প্রথিতযশা স্কুলের মতো শতকরা একশ'ভাগ শুধু পাশই করবে না, জি পি এ -৫ পেয়ে পাশ করে স্কুলের এবং পিতামাতার মর্যাদা উন্নত করবে। এমন আশাই আমরা অভিভাবকগন করতে পারি। আমাদের এই স্কুলের জন্যে তেমন একটি অনিন্দসুন্দর শিক্ষার পরিবেশ তৈরীতে আসুন দলমত নির্বিশেষে আমরা সবাই এক সঙ্গে কাজ করি।

৩০জুলাই ২০০৫এ দৈনিক যুগান্তর এ প্রকাশিত

কিছু প্রস্তাব
সকল বাংলা ওয়েব ম্যাগাজিনগুলোর সুহৃদ সম্পাদক বন্ধুবরেষু

আমাদের বাঙলা ওয়েব ম্যাগাজিনগুলোর সম্পাদকীয় নীতি কী হবে, তা স্ব স্ব ম্যাগাজিনের সম্পাদকগনই নির্ধারণ করে থাকেন। ইন্টারনেট এর জয় জয়কার বিশ্বে তাতে রয়েছে এখনও বহু অজানা ফাঁক ফোকর। সুভংকরের ফাঁকির সুযোগ। যে ফাঁক গলিয়ে অনেকেই ঢুকে পড়ে এবং সময়ে পার পেয়েও যায়। তাতে সম্পাদকগনই তার জন্যে দায়ী হয়ে পড়েন। আর সচেতন পাঠক মহলে তারা অপবাদ কুড়ান। হয়ে পড়েন কট্টর সমালোচনার পাত্র।

আমি মরুপলাশ এর পক্ষ হতে কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করছি। আমার মনে হয়েছে তাতে আমরা আমাদের ওয়েব প্রকাশনায় অনাকাঙ্খিত অনেক দায়ভার এড়াতে পারবো।

*ওয়েব প্রকাশনার ক্ষেত্রে যে নীতিমালাগুলো আমরা মেনে চলবো বলে একমত পোষণ করতে পারি- যেমন আমরা কোন লেখাই লেখকের পূর্ণাঙ্গ ডাটা ছবিসহ (যা শুধুমাত্র সম্পাদকের সংরক্ষণে থাকবে, তা প্রকাশের জন্যে নহে) পাওয়ার পরই যাচাই-বাচাই করে তা প্রকাশ করবো। লেখার সঙ্গে ছবি প্রকাশ হবে লেখকের অনুমতিক্রমে।

* সাহিত্য বিষয়ক লেখায় লেখকগন তাদের ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু সম্পাদকের নিকট থাকতেই হবে সেই লেখকের ছবিসহ পূর্ণাঙ্গ ডাটা।

*রিপোর্টধর্মী এবং কোন প্রতিবেদন লেখাতে ছদ্মনাম প্রকাশ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে লেখক যে দেশে আছেন সে দেশের কর্তৃপক্ষের বরাদ্ধকৃত আইডি কিংবা নিজ পাশপোর্ট এর কপি সম্পাদকের সংরক্ষণে অবশ্যই পাঠাতে হবে। পাঠাতে হবে লেখার স্বপক্ষে সকল তথ্যপ্রমানাধি। আর তাহলেই একজন সম্পাদক তার একটি বিশেষ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হলেন বলে ধরে নেয়া যাবে। এতে একজন সম্পাদক অনেক দায়ভার থেকেও নিজকে মুক্ত রাখতে পারবেন। কিন্তু আমরা যদি উড়ো কোন লেখা হঠাৎ করেই প্রকাশ করে একটি হাঙ্গামার সৃষ্টি করে দিলাম। অথচ বাস্তবে যার কোন ভিত্তিই খুঁজে পাওয়া গেল না। তার দায়ভার সম্পাদকগন কীভাবে নেবেন? যে লোক লিখেছে, তার লেখায় হয়তো কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির কারণ কিংবা কারো মনোকষ্টের অথবা মানহানির কারণ হয়েছে। তার কোন ডকুমেন্ট সম্পাদকের সংরক্ষণে নেই। যে লিখেছে সে লোকতো পার পেয়ে গেলো। কিন্তু হলেন সম্পাদক বদনামী। সম্পাদকের অবস্থা তখন হ য ব র ল। আমরা ওয়েব সম্পাদকগনতো কোন অবস্থাতেই দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিতে পারি না। তাই আমাদের এই ইন্টারনেট মিডিয়াতে যতটুকু পারা যায় অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে পা বাড়াতে হবে্।

* আমাদের মনে রাখতে হবে- আমাদের্ উদ্দেশ্য সস্তা বাহবা কিংবা করতালি নয়। কাউকে বড় কিংবা খাটো করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই মানবকল্যান। একটি অনিন্দসুন্দর নীতিমালার মাধ্যমে ওয়েব প্রকাশনায় কাজ করা এবং মানবকল্যানে নিজেদের নিবেদন করা। যা সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করবে। আমাদের কাঁধে কেউ বন্দুক রেখে কাউকে গুলি করে পার

পেয়ে যাবে, আর আমরা সম্পাদকগন হবো তার জন্যে দায়ী, পড়বো জবাবদিহিতার মুখে। তেমন সুযোগ আমরা কাউকে দেব না। একটু ভেবে দেখুন এমনি কথাগুলোর সাথে সবাই একমতে আসতে পারি কিনা।

* আসুন আমরা সবাই মিলে 'সম্পাদক সুজন' কিংবা 'বাংলা ওয়েব ম্যাগাজিন এডিটরস এসোসিয়েশান' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলি। যাতে থাকবো আমরা সবাই সম্মানিত মেম্বার। যেখানে অন্যকোন পদ থাকবে না। তাতে আমাদের পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাস গড়ে উঠবে। প্রতিষ্ঠিত হবে সহযোগিতার মানসিকতাও।

*ধীমান সম্পাদক বন্ধুগন চলুন সবাই একে অপরের ওয়েবগুলোতে মাসে কম করে হলেও একটি লেখা লিখি। তাতে আমাদের পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ বাড়বে এবং তাতে আমাদের চিন্তাচেতনার বিনিময়ও হতে পারে। সুপ্রিয় সম্পাদকগন আমার প্রস্তাবগুলো একটু গভীরভাবে ভেবে দেখার জন্যে অনুরোধ করছি। আমি আশা করি আপনারা নিজ নিজ ওয়েবে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করবেন। কিংবা ব্যক্তিগতভাবেও জানাতে পারেন।

...এই লেখাটি ছিলো সকল বাংলা ওয়েব ম্যাগাজিন সম্পাদকদের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত চিঠি। কিন্তু কেউ কেউ ইহা তাদের ম্যাগাজিনে প্রথমেই প্রকাশ করে দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তারা কোন নিয়ম-নীতির মধ্যে নেই। কেউ আবার তাদের ভাড়াটে লেখকদের মাধ্যমে আমার এই লেখাটির কট্টর সমালোচনা করিয়েছেন। ব্যাচ ! আমি নীরব হয়ে গেলাম। তবে আমি আমার ওয়েবে উক্ত নিয়মগুলো কঠিনভাবে মেনে চলি।

চ্যানেল আই এর তৃতীয় মাত্রা

প্রতিয়েষু
জিল্লুর রহমান
পরিচালক
তৃতীয় মাত্রা
চ্যানেল আই
ঢাকা, বাংলাদেশ

শরতের শ্বেতশুভ্র কাশফুলের শুভেচ্ছা। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫ইং বৃহস্পতিবার রাতে আপনার পরিচালিত তৃতীয় মাত্রায় অংশগ্রহণকারী মেলবর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা বিভাগের ফেলো ড. চঞ্চল খান এবং সাংবাদিক, কলামিস্ট মোজাম্মেল বাবুর আলোচনা গভীর মনোযোগের সঙ্গে উপভোগ করলাম। এমন সত্যভাষীদের সংখ্যাই বর্তমানে আমাদের সমাজে বিরল। সত্য কথা বলতে গেলেই কেউ না কেউ বলে ফেলবে, সে অমুক দলকে সমর্থন করে কথা বলছে। বলবে ওনাদের কথা দলীয় ভাইরাসে আক্রান্ত। আসতে থাকবে হুমকিও। এ প্রসঙ্গে আমার লেখা একটি ছড়া মনে পড়লো। যা আপনাকে এবং তৃতীয় মাত্রার শ্রোতাদের শোনাবার লোভ সামলাতে পারলাম না। ছড়াটির প্রথম ক'টি পঙ্‌ক্তি..... সত্য যে ভাই মিষ্টি নয় / দোয়েল-শ্যামার শিসটি নয় / সত্য বলায় কষ্ট হয় / কত্তো শত নষ্ট হয় / তবুওতো আসল নকল / সত্য দিয়েই পষ্ট হয়.....।। আমি তো বলবো, এমন সত্যভাষী ও সৎসাহসীর সংখ্যা আজকাল যতোই বাড়বে ততোই মঙ্গল। অন্ততঃ মিথ্যাচারের সুনামীতে লন্ডভন্ড সমাজে এরা খড়কুটো হয়ে আমাদের কিছুটা আত্মরক্ষার যোগান দেবে। তাঁদের দু'জনকেই আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও ধন্যবাদ পৌঁছে দিলে কৃতজ্ঞ হবো।

তাঁদের দীপ্ত-সাহসের প্রশংসা না করে পারছি না। যারা অকপটে উচ্চারণ করলেন কয়েকটি চরম সত্য যেমন- বঙ্গাবন্ধু এবং জিয়া তাঁরা কেউই কোনো দলের ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। তারা জাতির সম্পদ। তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন এখন আমাদের জাতীয় নৈতিক দায়িত্ব। জয়বাংলাও তেমনি আমাদের জাতীয় শোগান হওয়া উচিৎ। যা ছিলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শোগান এবং প্রেরণা। '৭১এ আমাদের হাতিয়ার গর্জে উঠতো এই ***জয়বাংলা*** বলেই। অথচ দলীয় দৃষ্টিকোন থেকে জয়বাংলাকে সংকীর্ণ করা হয়েছে। অমর্যাদা করা হয়েছে।

জাতীয় স্বার্থেই আমাদের জাতীয় নেতা-নেত্রীরাও একটু বেশী সচেতন হওয়া জরুরী। জাতি যাদের ঝাড়ু মিছিলের মাধ্যমে ধিক্কার দেয়, ঘৃণা করে। সেই ধিকৃতজনদের ছায়া মাড়িয়ে কেন তারা নিজেরা কলংকিত হবেন! প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন?

সবচে' ন্যাক্কারজনক আমাদের চরিত্র হলো, সহজ-সরল এবং মিমাংসিত সত্যকে নিদারুণভাবে অস্বীকার করা। অথচ স্বীকারের মাধ্যমেই মহত্ব এবং উদারতা লুকিয়ে আছে। আজ আপনি আমাকে স্বীকার করলেই কাল আমি করবো। আমি না করলেও অন্য কেহ করবেই। আমাদের হৃদয় আজকাল সীমাহীন কূটিলতার কালিমায় ভরে গেছে। আসুন না হৃদয়কে আমরা শরতের শ্বেতশুভ্র কাশফুলের মতো গড়ে তুলি।

ধন্যবাদান্তে-
তারিখঃ ১৬সেপ্টেম্বর ২০০৫ইং

চ্যানেল আই এর কর্তৃপক্ষের নিকট মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসীদের কিছু জিজ্ঞাসা

যে কোন গনমাধ্যম নিরপেক্ষ হয়ে দেশ ও দশের জন্যে কাজ করবে এটাই আমরা জানি। যদিও কেহ কেহ নিরপেক্ষতার ধজ্বাধারী হয়েও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটিতে একটি বেসরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাঙালি প্রায় দেড় মিলিয়ন কর্মরত। এই বিশাল সংখ্যক প্রবাসীদের মধ্যে হাতেগোনা কিছু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং এখানকার কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত কয়েকজন শিক্ষক বিশিষ্ট বাঙালি নাগরিক আছেন। আর কিছু ব্যবসায়ী ছাড়া অন্যদের চাকুরী জীবন উলেখ করার মতো নয়। জাষ্ট বলা যায় ' দ্যা আর হ্যান্ড টু মাউথ'। এখানেই বাংলাদেশের একটি স্যাটেলাইট চ্যানেল আই তার কার্যক্রম জনপ্রিয় করার জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছে বিগত পাঁচ বছর পর। যদিও চ্যানেলটির জন্ম পাঁচ বছর পূর্বে। গত কিছুদিন আগেও আমরা জানতাম না এ নামে বাংলাদেশের একটি চ্যানেল আছে। আমরা জানতাম এবং একচেটিয়া জনপ্রিয় ছিল চ্যানেল 'একুশ'।

সম্প্রতি চ্যানেল আই এর একজন প্রতিনিধি এসেছিলেন রিয়াদে। এখানকার কিছুসংখ্যক অতিউৎসাহী আত্মপ্রচার প্রেমীকজনেরা সেই প্রতিনির্ধির সৌজন্যে (সম্ভবত: তিনি শেখ সিরাজ নাকি সাইখ সিরাজ, মাফ করবেন আমি ওনার নামটি যেভাবে শোনেছি।) একটি সংবর্ধনার সঙ্গো চ্যানেল আই সম্পর্কে সুধীজনের মতবিনিময় অনুষ্ঠান এর আয়োজন করেছিলেন। সেখানে বিশেষ অতিথি এবং অন্যান্য অতিথিদের মাঝে যারাই উপস্থিত ছিলেন তাদের অনেকেই ছিলেন বর্তমান সরকারের সমর্থক যাকে বলা চলে নেতা-কর্মী এবং 'ম্যানপাওয়ার' ও হুন্ডি ব্যবসায়ী।

এখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল বাংলাদেশের ডক্টরেট ডিগ্রীধারী বিশিষ্ট নাগরিকগন কর্মরত রয়েছেন, তাদের কেউ কিন্তু সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। যাদের নিয়ে এই প্রবাসে আমরা গর্ব করে থাকি। দূতাবাস সম্পর্কে কথা বলছি না। কেননা আমরা জানি, যখন যে সরকার আসেন দূতাবাস হয় তাদেরই তল্পীবাহক। তারা কখনোই সাধারণ প্রবাসীদের বাহক হতে পারেন না। তেমন প্রচেষ্টাও তাদের মানসিকতায় কখনোই পরিলক্ষিত হয়নি। ওনারা সবসময়ই নিজেদের বিশেষ শ্রেণীর লোক ভাবেন এবং তথাকথিত বিশেষ শ্রেণীর সাথেই সুসম্পর্ক রাখেন(?!) উলেখিত অনুষ্ঠানে দূতাবাসেরও কেউ কেউ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হয়েছে বলে আই প্রতিনিধি মনে করেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে বিষয়টি যে একপেশে হয়ে গেছে তা বলাই বাহুল্য। তিনি এক কর্ণারে এসে প্রবেশ করে কিছু ছবি নিয়ে গেলেন এবং তা প্রচার করে মোটামুটি চ্যানেল আই এর আদর্শ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের একটি পরিস্কার ধারণা দিয়ে দিলেন। নির্দ্বিধায় বলা যায় তা পরিস্কারভাবেই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। তাতে আমরা আহত না হয়ে শুধু অবাক হয়েছি! কেন না আহত হবার মত বাংলাদেশে এখন আর কিছু কি অবশিষ্ট আছে? চ্যানেল আই এর প্রতিনিধিগন বিভিন্ন স্থান থেকে যারা সংবাদ প্রেরণ করে থাকেন, তাদের অনেককেই মিনি পর্দায় বড় বেমানান লাগে। একুশ চ্যানেলের মতো একটু বেছে-সেচে নিলে দর্শকদের কাছে দেখতে ভালো লাগতো। বিশেষ করে স্যাটেলাইট মিডিয়াতে 'ফেস্ ভ্যাল' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুনদের আমরা সব সময়ই স্বাগত: জানাই কিন্তু তাই বলে পুরোনো মেধাবীদের অবহেলা করে নয়। চ্যানেল আই এর অধিকাংশ নাটকগুলো এতবেশী নিম্নমানের যে, তাতে মনে হয় বাংলাদেশে মেধাধারী লেখকের বড় আকাল পড়েছে।

এই চ্যানেলের আর একটি কিম্ভুতকিমাকার অনুষ্ঠান 'তৃতীয় মাত্রা' যা প্রচার করে আই চ্যানেল হয়তো ভাবছে একেবারে কেলা ফতেহ। না। তা কিন্তু নয়। সেখানে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ব্যক্তি প্রচারের একটি বিশেষ ব্যবস্থা করেছে চ্যানেল আই। যাদের নাম এবং চেহারা প্রকাশ করা এক জনমেও সম্ভব হতো না। তারা সে সুযোগটি নিজেরাই তৈরী করে নিয়েছেন! লাভটা শুধু তাদেরই হচ্ছে। তাতে দেশের ও দশের কোন কল্যান বয়ে আনবে না বা এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ দেশটার কোন পুষ্টি সাধন হবে বলে আমরা মনে করি না। তিন চারজন মহিলাকে পাশাপাশি দাঁড় করায়ে অনুষ্ঠান সূচীর বর্ণনা দেয়াতে কোন বিশেষত্ব আছে কি? বিষয়টি খুবই দৃষ্টিকটু। এদের প্রচার করতে চাইলে অনেক রাস্তাইতো আছে। এভাবে কেন? কর্তৃপক্ষ এদিকে একটু নজর দেবেন কি? স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'হাসি' স্বাস্থ্যের জন্যে খুবই উপকারী। 'চিঠি আপার' হাসিটা ভালো তবে একটু কম হাসলে মানে হাসিতে আরও একটু সংযত হলে আরো বেশী ভালো লাগবে।

'চিঠি পেলাম' অনুষ্ঠানে আমার এ চিঠিটি প্রচারের উপযুক্ততা পাবে বলে মনে হয় না। তবুও চ্যানেল আই এর সৎসাহস থাকলে পড়ে শুনিয়ে দিন না এ চিঠিটি সউদী প্রবাসী ১৫ লাখ বাঙালিদের। চ্যানেল আইয়ের চোখ খুলবে, সুমতি হবে এবং বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করবে তেমন প্রত্যাশায়.........

***চ্যানল আই কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হয়েছে**
*** বিদেশের সবকটা ওয়েব ম্যাগাজিনে প্রকাশিত।**

এইতো স্বজনবিহীন বিদেশের ঈদ

মনটা খুবই চিনচিনেয় উঠলো আমার ছোট্ট মেয়ে রিয়াদে জন্মগ্রহণকারী সাড়ে পাঁচ বছরের 'বৈশাখী'র কিছু কথায়। সে জানতে চাইলো–আব্বু এই যে তোমার সঙ্গে ঈদের নামাজ পড়লাম। এটাই কি ঈদ!? এখানে ত কেউ নেই। দাদু, নানু, মামা মামানিরা কেউ নেই। কোথায় বেড়াতে যাবো। কাকে পা ধরে সালাম করলে ঈদের টাকা দেবে? তোমাদের হাসপাতালের গার্ডেনে এলাম। মসজিদের সামনে তো বহু বিদেশী বাচ্চা ছিলো। এখানে কেউ নেই। কার সঙ্গে খেলবো? কথা ক'টি বলতে গিয়ে সে প্রায় কেঁদেই ফেললো।

বাচ্চাদের পড়ালেখার সুবিধার জন্যে আমি বাসা নিয়েছি আমার কর্মস্থল থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দুরের 'হাইয়াল ওজারা' এলাকায়। বাঙালিদের স্কুলের ৬ শত গার্ডিয়ানের প্রায় সিংহভাগই এই এলাকায় থাকেন। 'হাইয়াল ওজারা' এলাকার নামটি বাঙালিরাই সংক্ষিপ্ত করে নাম দিয়েছেন 'হারা'। সবচে' বড় কথা এখানেই বাচ্চাদের স্কুল। বলা যায় ইহা একটি মিনি বাংলাদেশ। এখানেই কয়েকটি মসজিদ আছে, যেখানে ঈদের নামাজ হয়। কিন্তু আমাদের বিদেশী ষ্টাফ বিশেষ করে পশ্চিমা মুসলিম ডাক্তার, নার্সদের অনুরোধ যে, আমরা হাসপাতাল ষ্টাফরা যেন একসাথে ঈদের নামাজ পড়ি। তাই ভোর রাত ৪ টায় উঠে বউ-বাচ্চাদের তৈরী করে দাম্মাম হাইওয়ে ধরে এই তিরিশ কিলোমিটার পথ ড্রাইভ করে হাসপাতালের মসজিদে পৌছতে হয় সকাল ৬ টার মধ্যে। এখানে সর্বত্রই ঈদের নামাজে সকল জাতীয়তার মা-মহিলাগন ঈদের নামাজে অংশগ্রহন করেন। এখানকার ইহা একটি সাধারণ দৃশ্য।

হ্যাঁ এইতো স্বজন বিহীন বিদেশের ঈদ? কী দিয়ে স্বদেশের মা-মাটি-মানুষকে বোঝাবো। আমাদের প্রবাসী বাঙালিদের ঈদ এমনই। এমনিভাবে চাপিয়ে রাখি বুকের গহীনে ছাঁই চাপা অনল। যারা ব্যাচেলর তাদের ঈদ আরো করুণ। ভোর পাঁচটায় উঠে গোসল করে তৈরী হয়ে ঈদের নামাজের জন্যে নির্ধারিত মসজিদে পৌঁছতে হবে। ফজরের নামাজ পড়ে সূর্য উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ঈদের নামাজের জন্যে। সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে ঈমাম দাঁড়ায়ে ঘোষণা দেবেন ঈদের নামাজের জন্য সবাই দাঁড়িয়ে যান। নামাজ শেষে শুধুমাত্র পরিচিতজনদের সঙ্গে (সাউথ এবং সাউথ ইষ্ট এশিয়ানরা) গলাগলি করে বাসায় ফিরেন। এসেই দেন লম্বা ঘুম। আর অনেকেই কল কেবিনগুলোতে গিয়ে ভিড় জমান স্বজনদের জানানোর জন্যে যে, সে ঈদ করে এলো। স্বজনদের এবং আদরের বাচ্চাদের সঙ্গে ঈদের কথা বলতে গিয়ে প্রায় সবাই কেঁদে কেটে কলকেবিনগুলো ভারী করে তুলেন। সে এক হৃদয় বিদারক ক্ষণ, দৃশ্য। বাস্তবে যে না দেখেছে তার অনুমান করাও কঠিন।

অবশেষে কী দিয়ে বৈশাখীকে শান্তনা দেবো। বললাম- আব্বু মট্‌কা যাবে? মক্কাকে বৈশাখী মট্‌কা বলে উচ্চারণ করে থাকে। (বৈশাখী এক বছর বয়স থেকে প্রতিবছরই আমাদের সঙ্গে রমজানে ওমরা করতে মক্কা গিয়েছে) সে দুরের ভ্রমন খুব পছন্দ করে তাই তাকে এমন শান্তনার কথা বলা। আর যায় কৈ! শুরু হয়ে গেল তার বিরামহীন টেপরেকর্ড। চল এখনই চল মট্‌কায় যাবো। সে যদি একবার একটি কথা উচ্চারণ করলো তো আর তাকে অন্য কথা দিয়ে সে কথা ভুলানো যাবে না। বলতেই থাকবে। ভাবলাম আমার কর্মস্থল হাসপাতাল ছুটি আছে নয় দিন। অফিসিয়াল ছুটি বলতে বছরে দু'টি ঈদেই আমাদের এই নয়দিন করে ছুটি। ঠিক করলাম মক্কাই যাবো। ওমরা সেরে জেদ্দায় গিয়ে 'রেড সি' লোহিত সাগরও দেখে আসবো। বাচ্চাদের ইচ্ছাও তাই। বাসায় এসে খেয়ে দেয়ে নিজ গাড়িতে করেই মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম বেলা বারোটায়। দুরের ভ্রমনে যাচ্ছে এটা মনে করে বাচ্চাদের আনন্দের সীমা নেই। গাড়ীতেই তারা ঈদের আনন্দটা করে নিলো।

সুপ্রিয় স্বদেশের পাঠকগন এবার ভেবে দেখুন বিদেশে আমাদের প্রবাসীদের ঈদটা কতো সীমাহীন মনোকষ্টের। আপনারা যারা স্বজনদের পাশে আছে, বিশেষ করে দেশের ভৌগোলিক সীমানায় আছেন আপনারা ইচ্ছা করলেই স্বজনদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ শেয়ার করতে পারেন। কিন্তু আমরা প্রবাসীরা কতোটা অভাগা যে, আমাদের শত ইচ্ছা থাকা সত্বেয় তা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তবুও শান্তনা আমাদের প্রবাসীদের রেমিটেন্সে দেশ একদিন সমৃদ্ধ হবে। দেশে ফিরে (যদি সে পর্যন্ত শ্রষ্টা আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন) এবং দেশে গিয়েও যদি বেঁচে থাকার তেমন নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, মানে যদি স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি থাকে, তাহলে তখনই আমরা ঈদের আনন্দ স্বজনদের সাথে শেয়ার করবো। তেমন অনাগত সোনালী দিনের প্রত্যাশায় বুক বেঁধে আমরা অপেক্ষা আছি। নবগঠিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সিটিতে ফ্রান্স, ইটালী, জাপান এবং সউদী আরবের জেদ্দা, দাম্মাম, মদিনা, তায়েফ, মক্কা, সাকাকা, খামিস মোশায়েত, হপুপ, তাবুক, ইয়ানবো, বুরাইদা, আলগাছিম, গুরাইয়াত, আল খারেজ, আল খাফজী, হাফার আল বাতেন, আবহা শহরের যুগান্তর পরবাস সমাবেশের সকল বন্ধুদের ঈদ শুভেচ্ছা এবং ঈদোত্তর বর্ণিল শুভেচ্ছা।

ঈদ আসে অই ঈদ আসে
স্বজনহারা বিদেশে
নামাজ শেষে বাঙালিদের
দুঃখ ভুলার নিদ্ আসে।

অক্টোবর ২৫, ২০০৫ইং
* এই লেখাটি 'চাপিয়ে রাখি বুকের গহীনে ছাই' শিরোনামে দৈনিক যুগান্তর এ প্রকাশিত ০৩ নভেম্বর ২০০৫ইং /খবর ডট কম

তসলিমা নাসরিন
এবং তার সকল গৃহ হারালো যার প্রসঙ্গো

তসলিমা নাসরিনকে আমি লেখিকা না বলে লেখক বলতেই পছন্দ করি। লেখকদের লিঙ্গা খোঁজার ভুলটি অন্তত: আমি করতে চাই না। পুংলিঙ্গা এবং স্ত্রী লিঙ্গারা যদি কবিতা লেখে তা হলে তাদের দু'প্রজাতিকেই কবি বলা হয় সভ্যতার খাতিরে। স্ত্রী লিঙ্গাকে মহিলা কবি বলে সম্বোধন করলে শুধু তাঁকেই অপমান করা হয়নি। অপমান করা হয় পুরো কবি কুলকেই, কবি সত্ত্বাকে, লেখক সত্ত্বাকে, এমনকি কবিতাকেও।

আমি নিজকে একজন সিরিয়াস রিডার হিসেবে জানি। এ কথা কেউ যদি না মানে তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি যা বলতে চাই, আর কোন ভনিতা না করে সরাসরি চলে যাচ্ছি সে প্রসঙ্গো। তসলিমা নাসরিন তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করে সকল গৃহ হারালো যার শিরোনামে যে নিবন্ধটি তিনি লিখেছেন- তা সাহিত্যমানের দিক থেকেও উৎরে গেছে। তাঁর সে রক্তক্ষরণের লেখাটি পড়ে আমার মগজেও রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। কবিতার ভাষায় বলা কথাগুলো বা শব্দগুলো আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখলাম টকটকে লাল পলাশের রঙে প্রতিটি শব্দ তরতাজা রক্তে রঞ্জিত। এ রক্ত একজন লেখকসত্ত্বার, দেশপ্রেমিকের, একজন কবির, একজন কথাশিল্পীর, একজন কথাকারের, একজন সাহসী কলামিষ্ট এর। এ রক্তক্ষরণ স্পষ্ট করে বলার এবং সত্যকে সত্য করে বলার ফসল।

সত্য কভু মিষ্টি নয় / দোয়েল শ্যামার শিস্‌টি নয় /
সত্য বলায় কষ্ট হয় / কত্তোশত নষ্ট হয় / তবুওতো আসল নকল / সত্য দিয়েই পষ্ট হয়...।।

ঠিক সেই আসল নকল পষ্ট করতে গিয়েই তসলিমা নাসরিন স্বদেশের সোঁদামাটির গন্ধ ছেড়ে আজ নির্বাসিত জীবন-যাপন করছেন। স্বদেশ-স্বজন, মা-মাটি-মানুষ ছেড়ে কেউ কি থাকতে পারে? পারে না! বাধ্য করা হয়েছে এ লেখককে। কিন্তু কেন? তার লেখার জন্যে? কি এমন লিখেছেন তসলিমা? যার জন্যে তাকে নির্বাসিত জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। এ প্রশ্নগুলো আজ এক বিশাল জনগোষ্ঠির, লক্ষকোটি পাঠকের। কেন না আজও লক্ষকোটি পাঠক জানে না তসলিমার লেখায় মাঝে কী এমন ভাইরাস আছে। যা আমাদের ধ্বংসোন্মুখ সমাজের জন্যে ক্ষতিকর!

দেখা গেছে যখনই তসলিমার কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্গো সঙ্গোই এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবি, আমলা কাম লেখক, মৌ-লোভী লেখকরা সেই বইটির পেছনে লেগে যায়। এদের যোগ-সাজশেই দেশের নির্বাহী ক্ষমতাধরেরা লেখাটি কিংবা গ্রন্থটি নিষিদ্ধ ঘোষনা করে। এই সব বুদ্ধির বেপারীরাই অবলীলায় নিজের লেখক সত্ত্বা, বুদ্ধি-বিবেক সর্বস্ব (অসহায় বেশ্যার মতো (!?) বিক্রি করে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নেয়। নিজেদের চরিত্রটি পাঠকদের কাছে ঢাকা রেখে দেবতা সেজে বসেন। এদের কদর্য চেহারাটি তসলিমা সাধারণ পাঠকদের নিকট তুলে ধরেন বলেই তসলিমা এদের কাঠগড়ার আসামী, সীমালঙ্ঘনকারী! তসলিমার পেছনে লাগার আরও একটি প্রধান কারন এদের ছাই-ভস্ম লেখা পাঠকগন টানে না। টানে তসলিমার লেখাগুলো। তসলিমা বাজারে থাকলে এদের লেখাগুলো, গ্রন্থগুলো পাঠক ছুঁয়েও দেখবে না। তা ডাষ্টবিনে নিক্ষেপিত হবে।

নারী জাগরণের যে লেখা তসলিমা লিখেছেন, বাংলাদেশের শতকরা একজন নারীও তা পড়ে একটু ভেবেছে কিংবা তা অনুসরণ করেছে। এমনটি কিন্তু আমার মোটেই মনে হয়নি। কেন না শত যুগ ধরে অভ্যস্ত বাঙালি নারীগন সেবাদাসী / যৌনদাসী হিসেবেই থাকতে পছন্দ করেন। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের বোধ-বুদ্ধি অতটুকুই (সে যতই শিক্ষিত হোক) বিয়ের উপযুক্ত হলে স্বামীর ঘরে যাবে।

দু' বেলা খানাপিনার বদলা হিসেবে পুরুষের শয্যা সুখ দেবে। বাচ্চা পয়দা করবে। বাচ্চাকে পুর্নাঙ্গ নার্সিং দিয়ে বড় করবে। স্কুল নিয়ে যাবে। তাকে অনেক আদর্শের কথা শেখাবে। ঘরের সকল কাজও করবে মুখবুজে একজন চাকরানীর মতো। বাচ্চারা বড় হলে মেয়ে হলে বিয়ে দেবে এবং ছেলে হলে বিয়ে করাবে। নায়-নাতকুরে ঘর ভরে যাবে। বেলা শেষে একদিন সে নিজেই ঝরে যাবে। ব্যাচ এটাই তাদের মানে বঙ্গ ললনাদের জীবনের বিভিন্ন অংশের চিরাচরিত পরিচয়। এই একটি বৃত্তের মধ্যেই তারা ঘোর-পাক খাচ্ছে। কিন্তু এটাই কি একজন নারী তথা একজন মানুষের জীবনের সব কিছু?! এ সনাতনী চিন্তা-চেতনা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যেই তসলিমা বার বার আহবান করেছেন তাঁর লেখায়। পোঁড় খেয়ে খেয়ে যে শেখা, সেটাই জীবনের চরম শেখা।

তার সে উত্তমপুরুষে বর্ণনার লেখাগুলো সাহিত্যমানের সকল চমৎকারিত্বকে ছাড়িয়ে গেছে। তার সব লেখাই তার জীবনের চরম অভিজ্ঞতার ফসল। অথচ তার সে লেখার মাল-মশলা, বিষয়বস্তু, শিল্পবোধ, আহ্বানকে আমরা বার বারই বাঁকা দৃষ্টিতে দেখেছি।

প্রবাসী হবার পূর্বে মানে সেই আশির দশকের গোড়ার দিকে তার অনেক কলাম পড়েছি একটি সাপ্তাহিকে। তার একটি গ্রন্থে 'ভ্রমর কইও গিয়া' শিরোনামের একটি বড় গল্প পড়ে আমি রক্তাক্ত হয়েছি। সে রক্তাক্ত আজও হচ্ছি। কেননা তা ছিলো আমাদের সমাজের একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার বাস্তব দৃশ্য। লেখক লেখার সময় ছিলেন তার কলমের সঙ্গে অত্যন্ত সৎ। আর সৎ ছিলেন বলেই উপহার দিয়েছিলেন একের পর এক প্রাণবন্ত সব বিষয়-আশয়। আমার পাঠক জীবনে সে লেখার মতো করে আর কোন লেখা আজও পাইনি। কেন না আমরা লিখতে গেলে আর সৎ থাকতে পারি না।

আমাদের কলমসৈনিকগন নিজকে অতি মানব হিসেবে সব সময়ই নিজকে উপস্থাপন করতে ভালোবাসেন। আর তার কলমের একপাশে সত্য মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। সেখানে তসলিমা অবশ্যই ব্যতিক্রম এবং তিনি অত্যন্ত সফল। তিনি গতানুগতিক ধারায় লিখেন না। তিনি প্রথাবিরোধী লেখক। তেমনি আরো একজন পন্ডিত ব্যক্তি আছেন যিনি বহুমাত্রিক এবং প্রথাবিরোধী লেখক। তিনি শ্রদ্ধেয় ডঃ হুমায়ুন আজাদ। আমাদের অন্যান্য লেখকদের মতো তসলিমা গড্ডালিকা প্রবাহে নিজকে ভাসিয়ে দেননি। তাই তাঁর প্রতি আমার আজীবনের শ্রদ্ধা।

আমি মনে করি আমাদের দেশে আরও দু'চার জন তসলিমা নাসরিনের জন্ম হওয়া অত্যন্ত জরুরী। তিনি এই সমাজ ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন চান। সংস্কার চান সিরিয়াস্লী। তাইতো তিনি অতীব সাহসিকতার সঙ্গে উচ্চারণ করেন......পান হতে খসিয়েছি সংস্কারের চুন....।। সেই চুন খসাতে গিয়ে তিনি নিজেই খসে পড়লেন নিজ বাসভূম থেকে। তাতে কি হয়েছে? তিনি আজও লক্ষকোটি পাঠকের হৃদয়ে মহারানীর স্থানটি দখল করে আছেন।

আমি মনে করি কোন লেখকের কোন প্রকাশনাই নিষিদ্ধ ঘোষনা করা ঠিক নয়। যদি তাতে রাষ্ট্রবিরোধী কোন বিষয় না থাকে। কেননা লেখক যখন লেখেন তখন তার লেখাটি তার পরম সম্পত্তি। যখন তা প্রকাশিত হয়ে যায় তখন হয় পাঠকের সম্পত্তি। অতএব পাঠক লেখাটি পড়বে। সে নিজেই ভাববে-বিবেচনা করবে- কী আসল আর কী নকল। কোনটা সে গ্রহণ করবে আর কোনটা সে বর্জন করবে।

একটা সময় ছিলো ‘শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যে’ এমন কিছু বই বাজারে পাওয়া যেত। যাতে পিন্‌মারা মানে স্টেপলিং করা থাকতো। আর তাতে নিষিদ্ধ সুখ আছে ভেবে অনেকেই লুকিয়ে লুকিয়ে সেই বই পড়তো। কেননা নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের আজন্ম আকর্ষণ।

সে সকল বই এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। মানে পাঠকগন নিজেরাই বর্জন করেছে। তারা তা গ্রহণ করেনি। অতএব লেখকের বলার স্বাধীনতা থাকতেই হবে। বলা এবং লেখার স্বাধীনতা থাকলেই বিভিন্ন মতের মিশ্রন থেকে একটি অনিন্দ সুন্দর জিনিস বেরিয়ে আসবে। এ বিষয়গুলো থেকেই আমরা পাঠকগন বার বার বঞ্চিত হচ্ছি। সহজ করে বলা যায় পাঠকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। তসলিমা নাসরিনের অধিকাংশ লেখা থেকেই পাঠকগন বঞ্চিত। একশ্রেণীর আঁতেল এবং ভাড়াটে লেখক ও হলুদ সাংবাদিক, আমলা কাম লেখকদের পরামর্শে পত্রিকার মাধ্যমে পাঠকদের একটি বাজে ধারণা দিয়ে বইটি বাজেয়াপ্ত করেন সরকার। বিশেষ করে তসলিমার বেলায় বারবারই এমনটি ঘটেছে। যা পাঠকদের মোটেই কাম্য ছিলো না।

একজন লেখক যখন তার নিজের কথা লিখবেন মানে তিনি আত্মজীবনী লিখবেন তখন সম্পূর্ণ সৎ হয়েই তার জীবনের পরতে পরতে যে আনন্দ বেদনার গানগুলো লুকিয়ে আছে তা পাঠকদের শোনাবেন। সেখানে যদি একটু বেলেল্লাপনাও থেকে থাকে তাও তিনি লিখবেন। যদি তিনি সৎ হয়ে থাকেন। আমরা রক্ত-মাংসের মানুষ তাই সবার জীবনেই আলোর পাশাপাশি কিছু অন্ধকার থাকে। সেখানে কিছু গন্দমের গন্ধও থাকে। এটা ন্যাচারাল। থাকতেই পারে। সেখান থেকেও অনেক কিছু শিখেন একজন লেখক।

আর তা যদি তিনি সততার সাথে বর্ণনা করে পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করেন, তাতে পাঠকগনও সেখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে। আর তাই করেছেন তসলিমা নাসরিন। ওনি কি ভুল করেছেন? না তিনি কোন ভুল করেননি। তার লেখা নিয়ে আজ যারা মাতামাতি করে প্রকৃতপক্ষে তাদের চরিত্র নিয়েই এখন পাঠকদের মধ্যে সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে! এ কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখন সময় এসেছে। তসলিমা সম্পর্কে আমরা জানতে চাই। তাঁর লেখাগুলো আমরা পাঠকগন পড়তে চাই।

প্রকাশিত খবর ডট কম

কফিন

(প্রবাসে আমার জানা এক প্রবাসীর মর্মান্তিক মৃত্যুকে নিয়ে আমি সংবাদ তৈরী না করে তাকে প্রবাসীদের হৃদয়ে গেঁথে রাখার জন্যে বিষয়টি গল্পে রূপ দিয়েছি। প্রায় ৭৮শতাংশ বাস্তবতার সঙ্গে গল্পের ছলে আমি ২২শতাংশ আবেগ যোগ করেছি মাত্র। পাঠকদের হৃদয়ে এক প্রবাসীর অসহায় বধূ জানুর প্রতি যদি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়ে থাকি, তাহলে আমার এ শ্রম সার্থক হয়েছে বলে ধরে নেব।)

মোহাম্মদ জমির হোসেন প্রিয়ার চিঠি পেয়ে রীতিমতো আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। প্রবাসী বাঙালিই শুধু নয়। সকল প্রবাসীরাই স্বজনদের চিঠি পেলে এমনি আনন্দে লাফায়। বিনোদনহীন আরব মরূতে চিঠিই একমাত্র বিনোদন। কেননা তাতে মাখা থাকে প্রীতি, শুভেচ্ছা, প্রেম বিরহ। এমনকি দেশের মাটির গন্ধ। অনেকের মতো তাই জমির ও শতবার প্রিয়ার চিঠিটি পড়ে। বুকের উঁমে লুকিয়ে রাখে।

সারা দিনের খাটা খাটুনির পর সবেমাত্র জমির.কোম্পানির ভিলায় ফিরে এসেছে। ঘামে আর সিমেন্টের মিশ্রণে পরণের ইউনিফর্মটি একেবারে চিট্-চিটে। ডিউটির পোষাক খুলবে। গোসল করবে, এর পর সবার সাথে থালা হাতে খেতে লাইন দেবে। খানা শেষে কিছুক্ষন স্মৃতির জাবর কাটবে। নতুবা পুরাতন কোন চিঠি খুলে পড়বে। এরপরই ঘুমে ডুবে যাবে। আবার ফজরের আযান এর সঙ্গে সঙ্গে উঠে নামাজ পড়ে, নাস্তা করে ডিউটির জন্য তৈরী হবে। এমনি ছকবাঁধা প্রবাস জীবন সবার। অথচ প্রিয়ার চিঠি পেয়ে জমির সবকিছু ভুলে যায়। ডিউটির ইনিফরমটি পরা অবস্থায়ই সে তার বেডে গাটি এলিয়ে দিয়ে প্রিয়ার চিঠি খুলে।

আমার প্রানের প্রিয় জমির,

সীমাহীন ভালোবাসা নিও। জানো এ মুহূর্তে তোমাকে আমার খ-ু-উ-ব বেশী প্রয়োজন। দীর্ঘ সাত বছর পর অপয়া আর বাঁজা নামের অপবাদগুলো আমি মুছতে যাচ্ছি। তুমি বাপ হতে যাচেছা। তোমার সন্তান এখন আমার পেটে। প্রথম সন্তান বলেই অনেক দেরীতে টের পেলাম। স্বামী দুরে থাকলে এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। আমি দিনকে দিন মনমরা হয়ে যাচ্ছি। ভয়-শঙ্কা আমার চারিদিকে ছায়ার মত ঘুরছে।

সবাইতো ছেলে হবে বলেই চিল্লাচেছ। কেহ কেহ নামধাম ও ঠিক করে রেখেছে। সবাই চায় ছেলে সন্তান। একমাত্র শ্রষ্টাই জানে কী আসছে। এখানে তোমার আপনজন সবাই, ওরা আমার ও আপন। আদর যত্নের কোন ঘাটতি নেই। তারপরও তোমাকে ছাড়া মনের কথাগুলো কাউকে বলা যায়না। তাই তোমাকে দরকার। খু-উ-ব বেশী দরকার এখন। তুমি পাশে এলে আমার সাহস বাড়বে,শক্তি বাড়বে। মনের দুয়ার খুলে সব গুলো কথা তোমায় বলতে পারবো। তুমি পাশে এলে মরেও শান্তি পাবো। কেননা দীর্ঘ সাত বছর পর তোমার যে আমানত আমি পেটে ধরেছি, তা যদি তেমার হাতে তুলে দিয়ে চির বিদায় নেই। তাতেই পরম শান্তি।

একটি সন্তানের জন্য দীর্ঘ দিনের প্রার্থনা আমাদের। শ্রষ্টা যা দান করতে যাচ্ছেন। জানি তুমি এ খবরে লাফাবে। কিন্তু অমার খুশিও তো কিসে হয়, তা তোমার ভাবা উচিৎ। শুধু তুমি পাশে এলেই আমি খুশি।

সব নারীর এমনি মুহূর্ত গুলোতে নিজ স্বামীকে পাশে কামনা করে। অন্য কোন স্বজনকে নয়। আমি ও তাই। তুমি আসবে অবশ্যই। অবশ্যই আসবে।

-তোমারী অসহায়িনী প্রিয়া,

জানু

বাপ হতে যাচেছ, এমন খবরে আনন্দে জমিরের পেট ফেটে যাবার উপক্রম। তার সমস্ত দেহমনে আনন্দরা খই খই করছে। প্রতিবারই ছুটি শেষে বিদেশ ফিরে প্রিয়তমা পত্নীর কাছ থেকে এমনই একটি চিঠির আশায় থাকতো জমির। না পেয়ে বার বার হতাশ হয়েছে। কিন্তু এবার সত্যি সত্যি শ্রষ্টা তাদের দিকে ফিরে তাকিয়েছে। শ্রষ্টার দরবারে জমির শোকর আদয় করে।

কিন্তু সে দেশে কী ভাবে যাবে? যে ভাবনার কোন কূল কিনারা নেই। সবে মাত্র পাঁচ মাস হলো ছুটি থেকে এসেছে। চুক্তি অনুযায়ী দু'বছর পূর্ণ হবার পূর্বে সে ছুটি পাবে না। অন্যদিকে কোম্পানীর ম্যানেজারকে বোঝাতে পারলে হয়তো জরুরী ছুটি পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন তার প্রচুর টাকার দরকার। বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছে। দিন তারিখ ও ঠিক। পিতা একাধারে চিঠি দিয়ে চলছে টাকা পাঠাতে। বোনের স্বর্ণালংকার ছাড়াও ছেলেকে যৌতুক হিসেবে ব্যবসা করার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে।

একপাল ভাইবোনের খোর-পোষ লেখাপড়া, খরচের জোয়ালটি তাকে একাই টানতে হচেছ। আট দশটি ভাই বোনের ঘরে তাকে বউ নিয়ে থাকতে হয়। তার অনেক দিনের স্বপ্ন একটি আলাদা ঘরের। যা করা আজও সম্ভব হয়নি। সাত বছরের পুরো বিদেশের রোজগারের অর্থ পাঠায়েও বাপের অভাব মিটাতে পারেনি। বাপ তো বাপই। নয়জন সন্তান বর্তমান। এখনও সন্তান পয়দা করেন। ওসব নাকি কেবল আল্ল-াহ্ দান করেন ওনাকে।

কোম্পানীর নিয়মিত ওভারটাইম রয়েছে। যা জমিরকে করতে হয়। এরপরও হাজার সতর্ক দৃষ্টি ও নিয়ম ভেঙ্গে বাহিরে দু'এক ঘন্টার পারটাইম জব খুঁজে নেয়। প্রচুর কামায়। মাসের শেষে সামান্য কিছু রিয়াল রেখে বাকী সব পিতার কাছে পাঠায়। এতেই সে সুখ পায়। এমন সুখ সকল প্রবাসীর। এটাও একটা বিনোদন প্রবাসীদের জন্য।

জমির চিঠি লেখে প্রিয়তমা জানুকে। বার বারই একটা কথা লেখে। "আমি আসবো তোমার পাশে। ঠিক আমার নতুন মুখ পৃথিবীতে আসার পুর্বেই আসবো, কোন চিন্তা করোনা''। জমিরের সেই অসহায় মিথ্যে আশ্বাসের চিঠি পড়ে পড়ে জানু অপেক্ষার প্রহর গোনে। কিন্তু সেই অসহ্য অপেক্ষার প্রহরগুলো শেষ হতে চায় না।

দুই

অনেক অনেক অপেক্ষা আর হাজারো জল্পনা-কল্পনাকে ডিঙ্গিয়ে অবশেষে জানু দু'দুটো মেয়ে সন্তান লাভ করে। সবারই আশা ছিলো ছেলে সন্তানের। আর হলো বুঝি এক্কেবারে যমজ দুটি মেয়ে। মেয়ে দেখে হাহাকার পড়ে যায়। সবাই যেন ভীরমি খেয়ে পড়ে। ছেলের কামনা আমাদের সমাজে সবার। আর মেয়ের কামনা আরব সমাজে সবার।

আরব সমাজে মেয়ের মূল্য অনেক বেশী। কেননা এখানে বিয়েতে মেয়ের বাপকে বরপক্ষ প্রচুর সোনাদানা ছাড়াও লক্ষাধিক রিয়াল দিতে হয়। আমাদের গোঁড়াপন্থী পেছনমুখী সমাজে মেয়ে মানেই মহা বিপদ। মেয়ে হলেই মেযেদের বাপকে যে ব্যামো আর দানবটি দলে মথে মারে। সেটা হল ঘৃনিত যৌতুক। তাইতো ছেলের কামনা সবার। ...ছেলে হলেই পোয়া বারো/ কাম্য বাড়ে বেশী আরো!

জানুর পেটে জন্মেছে মেয়ে। এটা তার ইচেছ নয়। ইচেছ, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মেয়ে সন্তান দেখে বাড়ির সবাই যেন হাসি ভুলে গেলো। কিছুটা এড়িয়ে চলতে লাগলো। ওরা সবাই শরীসৃপের মতো এঁকে বেঁকে চলতে শুরু করলো। কিন্তু এ সংবাদে জমির খুশি। ভীষন খুশী। সে শুধু সন্তান চেয়েছে। শ্রষ্টা দিয়েছে। বিদেশে বন্ধুদের পার্টি দিয়ে মেয়েদের নাম ঘোষণা করে **'মরু'-'সাহারা'**। মরুভূমিতে থাকে বলেই ওই নামদ্বয় তার পছন্দ হয়েছে।

নারী জীবনের পূর্ণতা পাবার জন্য শ্বশুড় পরিবারের পরামর্শ অনুযায়ী জানু কোথায় না গিয়েছে? ওঝা, বৈদ্য, কবিরাজ। পীর-ফকির-দরবেশ। এমন কি মাজারে মাজারে গিয়েও মোমবাতি জ্বালিয়েছে। যদিও সে এসব পছন্দ করতো না। যখন কিছুতেই কিছু হচিছল না, তখন সে অনেকটা হতাশায় ভেঙ্গো পড়ে। সে ভাবতো এ সংসারে একপাল সন্তান থাকা সত্বেও নিজে একটি সন্তান না দিতে পারলে ওরা আবার জমির কে বিয়ে করাবে।

জায়া, ননদদের বিভিন্ন কানাঘুষায় সে বহুবার অমন সঙ্কেত পেয়েছে। শ্বাশুড়ীকেও সে অনেকবার বলতে শুনেছে,..জমির বাজান, তুই পছন্দ কইরা শিক্ষিত মাইয়া বিয়া করছোত্। সেটা ভালা। খুব ভালা। কিন্তু বাজান শিক্ষা ধুইয়া কী পানি খামু। যদি একটা পোলাপান নাদিতে পারে? তুই বাবা আরেকটা বিয়া কর। সন্তান না অইলে কি চলে? তোর ঘরে কে বাতি জ্বালাইবো? পোলা হোক আর মাইয়া হোক আমরা পোলাপান চাই।

জমির তার মায়ের কথা বার বারই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। কী যে বলেন মা? মানুষের জীবনে বিয়ে একটাই হওয়া উচিৎ। মনটাতো আর মাংসের টুকরো নয় যে, কেঁটে ভাগ করা যায়! তাই একাধিক বিয়ে করেও মন ভাগ করা যায় না। যদি সন্তান না হয়। ক্ষতি কী? আমার ভাই বোনতো অনেক আছে। তারাই বাতি জ্বালাবে। আমি অন্য বিয়ের কথা ভাবতেই পারিনি। দয়া করে এসব আর বলবেন না প্লিজ!।

তাতে করেই জানু জমিরের মধ্যে বিবাহত্তোর গভীর ভালোবাসা আর বিশ্বাসের সেতু গড়ে উঠেছে। যার মাঝ পথে বায়ু প্রবেশের কোন সুযোগ নেই। ওরা একে অন্যকে বিচার করে মনের সৌন্দর্য দিয়ে। তাই দু'টি সৌন্দর্য ভরা মন মিলনে মিলনে পরম তৃপ্তিতে অবগাহন করে।

জমিরের এ সন্তান লাভের পেছনে ঢাকার একজন মহিলা রোগ বিশেষজ্ঞের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ডাক্তারের নিকট পাঠাতে ওরা কেউ রাজী ছিলো না। জানুই জমিরকে নিয়ে সে ডাক্তারের কাছে গিয়েছে। চিকিৎসা পরামর্শ নিয়েছে। ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থেকেই সন্তান পেটে এসেছে। এখানে কোন ঝাঁড় ফুঁকের কার্যকারিতা নেই, কোন ভূমিকাও নেই। ঝাড় ফুঁকে কারো কখনোই সন্তান আসেনি। এটা শুধু ভন্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়।
এমন ধারণাই জানু আর জমিরের চেতনার কোষে কোষে। দু'জনেই সচেতন। তাই ওরা শুধু ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছে। ওদের পরিবার একদিন শুধু সন্তান চেয়েছে। আজ তারাই সন্তান চায় না। চায় ছেলে। ওদের চোখে মেয়েরা সন্তান নয়। জানু পেছনের ঐ সব কথা ভাবতে গিয়ে.... হায়রে দুনিয়া !! বলে একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

দেখতে দেখতে **মরু – সাহারার** বয়স এক বৎসর পূর্ণ হয়েছে। জমির পূর্বের চেয়ে ইদানিং বেশী বেশী চিঠি লেখে জানুকে। জানতে চায় মেয়েদের অবস্থা, স্ত্রীর শারিরীক অবস্থা। তাতে জানু খু উ ব খুশী। সে বোঝে বিদেশে স্বামীর অসহায়ত্ব। সন্তানের মুখে ফোটা নতুন শব্দ বোল-চাল নিয়ে জানু ও লিখে গভীর মমতায় ভরা চিঠি।

কোরিয়ান কোম্পানির ভিলায় অনেক বাঙালি। প্রায় সবাকে ডেকে জমির মেয়েদের প্রথম জন্ম বার্ষিকী পালন করে। মেয়ে দু'টির জন্য সবাই আশীর্বাদ করে। ছোটো খাটো উপঢৌকন দেয়। উপহার সামগ্রীতে জমিরের দেশে যাবার সুটকেসটি ভরে ওঠে। জমির সন্তানদের দেখার প্রবল টান অনুভব করে। সে এক নাড়ী ছেঁড়া টান! দেশে যাবার ও সপ্ন দেখে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ। জমিরের উন্নতি দেখে সবাই বলতে শুরু করেছে জমিরের মেয়ে ভাগ্য!! ইতোমধ্যে সে প্রমোশন পেয়েছে। বেতন বেড়েছে। কাজের চাপ কমেছে।

এবার তার মস্তিস্কে খেলা করতে থাকে একটি সুন্দর ঘর। ঘর না করা পর্যন্ত সেদেশে যাবে না। দেশে গিয়ে একগাদা ভাইবোনের মধ্যে একই ঘরে থাকতে হয়। স্ত্রীর সাথে মন খুলে কথাও বলতে পারে না। এ বড় লজ্জা এবং যন্ত্রণার ও। অসহ্য যন্ত্রণা বুকে চেপে তাকে বার বারই ছুটি শেষে দেশ থেকে আসতে হয়েছে। ঘরে তার এখন দুটি নতুন মুখ। এ ভাবে আর চলে না। এবার তার সিরিয়াস মনোভাব! কোম্পানী থেকে সে 'লোন' নিয়ে ঘর বানাবে। তার পরই দেশে যাবে।

স্ত্রীর কঠিন রোগ। তার অপারেশান দরকার। এমন সব অজুহাত দাঁড় করায়ে জমির কোম্পানীর কাছে লোনের জন্য আবেদন করে। এখন তার পজিশন কিছুটা উন্নত বলেই কোম্পানি তা অনুমোদন করে। তার কাজের নিষ্ঠার জন্যই সে লেবার থেকে লেবার ফোরম্যান হয়েছে। অতএব তার প্রতি কোম্পানীর সুনজর থাকাই স্বাভাবিক।

দেশ থেকে খবর এসেছে তার প্ল্যান অনুযায়ী না হলেও ঘর একটি দাঁড় করানো হয়েছে। তাতেও নাকি দেড় লক্ষাধিক টাকা চলে গেছে। ঘরের ছবিও জানু পাঠিয়েছে। বাপের দায়িত্বে থেকে ঘরটি গড়ে উঠেছে। জমির কিন্তু ঘরের খরচটা ওর হিসেবে মেলাতে পারেনি। বাপকে তো কিছুই বলা যায় না। বাপতো বাপই। তার তুলনা শুধু সে-ই। তার পরও জমিরের আলাদা ঘর হয়েছে। তাতে থাকছে তার স্ত্রী সন্তান। এটাই জমিরের মহা সান্তনা!

তিন

তিনটি বছর কেটে যাচেছ। ইচেছ থাকা সত্ত্বেয় জমির ছুটি যেতে পারছে না। আজও সন্তানদের সে চোখে দেখেনি কাছে থেকে। ছবিতে চুমু খেয়েছে। আদর করেছে। বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কোম্পানির টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত এখান থেকে কেহ ছুটি যেতে পারে না। সংসার বাচাঁয়ে লোন পরিশোধ করতে গিয়ে লম্বা সময় লেগে যায় জমিরের। মাত্র আর দুটি মাস। এর পর লোন খতম হবে। সামান্য কিছু টাকা নিয়ে হলেও সে দেশে যাবে। আর সে থাকতে পারছে না। দম যেন আটকে আসতে চায়।

ওদিকে জানু ও পেরেশান। জমির কেন দেশে যাচেছ না ? তাহলে কি সেও মেয়ে হয়েছে বলে দেশে যাওয়া বন্ধকরে দিয়েছে? এমনতরো প্রশ্নগুলো জানুর মাথায় ঘোরপাক খেতে থাকে। প্রতি চিঠিতেই জানু জমিরের হাজারো সমস্যার কথা জানতে পারে। তারপরও সে মনকে বোঝাতে পারছে না।

হঠাৎ করেই এক প্রবাসীর মাধ্যমে একটি চিঠি ও বাচচাদের জন্য কিছু মালামাল পায় জানু। চিঠিতে পেয়ে যায় জমিরের দেশে ফেরার তারিখ। জানুর চোখে মুখে আনন্দগুলো উৎরে পড়তে শুরু করে। জমির আরো লিখেছে ঐ তারিখের তিনদিন পুর্বে যাতে জানু বাচচাদের নিয়ে ঢাকাতে তার খালুর বাসায় আসে। সেখানে সে ফোনে বলে দেবে অনেক কিছু। ফ্লাইটের সময়। জানু মানসিক প্রস্তুতি নিচেছ। এক গোছা তাজা রজনীগন্ধা দিয়ে এবার সে জমিরকে বরণ করবে। বাচচাদের হাতে হাতে ও ফুল দেবে তাদের আব্বুকে বরণ করতে। হাজারো রঙিন স্বপ্ন নিয়ে জানু অপেক্ষা করছে।

সময় চলে এসেছে প্রায়। জমিরের দেয়া নির্দিষ্ট তারিখের এক সপ্তাহ পুর্বেই জানু তার খালুর বাসার উদ্দেশে রওনা হতে প্রস্তুতি নেয়। এতে কিন্তু সবাই বাঁধা দেয়। সবার বাঁধাকে উপেক্ষা করে ছোট একটি দেবরকে সাথে নিয়ে জানু ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হয়। ওরা সবাই জানুকে টিপ্পনি কেটে বলে–"মা র চে' মাসীর বেশী দরদ ভালা না''।

জমিরের দেয়া তারিখ পার হয়েও আরও পনের দিন চলে যায়। জানুর হৃদয় বারবার কেঁপে কেঁপে ওঠে। কেন এমনটি হচেছ? প্রতি রাতে সে কী সব ভয়াল ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখছে! তবে কি---? না, না জানু ওসব ভাবতে পারছে না। দিনকে দিন তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গো পড়তে শুরু করে।

ইতোমধ্যে তার শ্বশুড়ও ঢাকায় পৌঁছে। দিন যাচেছ, জমিরের কোন খবর নেই। একদিন বাচচাদের জন্য গুড়ো দুধ কিনতে সে বাজারে যায়। ফিরে এসে দেখে খুব ফর্সা টিপটপ পোষাকের একজন তরুণ তার খালুর বাসা থেকে বেরিয়ে যাচেছ। হাতে একটি ব্রিফকেইস দেখে সে ধরে নিয়েছে ঐ তরুণ নিশ্চয়ই মধ্যপ্রাচ্য ফেরৎ কেহ হবে। যে নাকি জমিরের খবর এনেছে। বাসাতে সবাকে খুব থম্ থমে মনে হলো। সে জানতে চাইলো কে এসেছিলো? মরু–সাহারার আব্বুর খবর কি সে নিয়ে এসেছে?

ওরা সবাই অন্যসব কথা বলছে। কেমন যেন পাশ কেটে যাচেছ প্রকৃত বিষয় থেকে। তার মনে হলো কোন একটা বিশেষ খবর ওরা তার কাছে লুকাচেছ। ওদের কোন কথাবার্তার মধ্যে সে এসে গেলেই সবার কথা বন্ধ হয়ে যায়। তাতে করে জানুর মনে ওদের প্রতি সন্দেহ জাগে। অপরিচিত মনে হয়। খালু খালা তাকে বোঝালো জমির আসতে আরো ক'দিন দেরী হবে। মা মনে কিছু করো না। আমাদের একটি বিশেষ পরিবার লন্ডন থেকে কাল আসছে। ওরা এখানে ক'দিন থাকবে। তাই তুমি বাচচাদের নিয়ে কালই বাড়ী যাও। জমিরকে নিয়ে তার বাপ এবং আমি নিজেই তোমাদের বাড়ি যাবো। কোনো চিন্তা করো না। আমরা খবর পেয়েছি সে খুব ভালো এবং সুস্থ আছে। প্লেনের সিট পাচেছ না বলে দেরী হচেছ। দু'চার দিনের মধ্যেই চলে আসবে। অগত্যা বাচচদের নিয়ে জানু বাড়ী চলে যায়।

শনিবার দিন। পশ্চিম দিগন্তে সবে মাত্র সূর্য লুটের গান চলছে। আহার শেষে পাখিরা সব দল বেঁধে আপন নীড়ের পানে উড়ে যাচেছ। বাড়ির পুর্ব পাশের বৃহদাকার বাঁশ বাগানে পাখিদের কিচিঁর মিচির এ মুখরিত সেই মনিহার গাঁওটি। অমন সময়ে কোত্থেকে একটি দাঁড় কাক কা কা রবে ঘরের উপরের জাম গাছটিতে এসে বসলো। সেকি তার গলা ফাটা চীৎকার। জানু তখোন পাক ঘরে ভাতের মাড় গালছিলো। এমন অসময়ে জানু কখনো কাকের ডাক শোনেনি। তার হৃদপিন্ড কাকের ডাকে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

জানু ডেক্‌ছি থেকে একমুঠো ভাত কাকের উদ্দেশ্যে বাহিরে ছুঁড়ে দিলো। ভাতের ডেক্‌চিটি দু'হাতে ধরে সে নতুন ঘরের উদ্দেশ্যে রওয়া না হলো। আবার ও কাকটি কা কা কা করে ডেকে উঠলে জানুর শরীরে মনে ভীষন একটা ধাক্কা অনুভব করলো। সমস্ত শরীরটি ঝিম মেরে হাত থেকে ভাতের পাতিলটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। পাতিল পড়ার সঙ্গো সঙ্গো তার মুখের মাটির শরাটি সশব্দে ভেঙ্গো কয়েক টুকরো হয়ে গেলো। ঠিক সেই মুহূর্তে ডালে বসা কাকটি আবারো কা কা করে ডাকতে ডাকতে কোথায় যেন উড়ে চলে গেলো। মসজিদে মসজিদে চলছে আজানের প্রস্তুতি। পাশের হিন্দু সাহা বাড়ী হতে ভেসে আসছে শংখ আর উলু ধ্বনি। সম্ভবত ওদের সন্ধ্যা পুজাঁর লগন চলছে।

জমিরদের বাড়ির পেছনের রাস্তায় এসে থেমেছে একটি মালবাহী ট্রাক। যে রাস্তায় রিক্সা ছাড়া অন্য কোন যান কখোনো চলেনি। সে রাস্তাতে হঠাৎ ট্রাক প্রবেশ করাতে কৌতুহলী অনেক লোকজন ভীড় জমালো। দেখতে দেখতে পাঁচ ছয়জন লোক সেই ট্রাক থেকে ছয়সাত ফুট লম্বা একটি কাঠের বাক্স নামাচেছ। বাড়ির পেছনের আমগাছটির নিচে দাঁড়িয়ে জানু অবাক বিশ্বয়ে সে দৃশ্য দেখছে। দুর থেকে সন্ধ্যার আবছা–

আলোতে সে কাউকে চিনতে পারছে না। জানু স্বগত: বাক্য আওড়ায়। ওরা কারা? ওই লম্বা কাঠের বাক্সটাতে এমন কী যে পাঁচ ছয়জনে ধরাধরি করে নামাচ্ছে। এবার কাঁধে বহন করছে। মৃত লাশ বহন করার মতোই ওরা কিছুক্ষণ পর পর একে অপরের স্থান দখল করছে। জানু আরো বিশ্বয়ভরা চোখে দেখে, বাক্সটি জমিরদের বাড়ির দিকেই আসছে!

বাক্সটি জমিরের বাড়ির খুব কাছাকাছি এসে গেছে। সাথে অনেক লোকজন-ছেলেমেয়ে কীসব বলাবলি করছে। জানুর মনের প্রশ্ন বাক্সটি নিয়ে, ওরা এ বাড়ীতেই আসছে কেন?

বাড়ির উঠানে বাক্সটি সন্তর্পনে রাখা হলো। পর্দার বেড়ার আড়াল থেকে দেখতে পায় তার খালু এবং শ্বশুড় অশ্রুজল মুছছে। ঢাকায় দেখা সেই তরুণ যুবকটি বড়ো একটি লাগেজ এবং একটি ব্রিফকেইস নিয়ে দাঁড়ায়ে। জানু এখনও কিছু শোনেনি। জানেনি। অথচ কী এক অজানা আশংকায় তার দু'পায়ের তালু থেকে ঝিম্ ধরা শুরু হয়েছে।
হঠাৎ করেই ঢাকায় দেখা সেই ফর্সা তরুণটি উচচ স্বরে বলতে শুরু করলো-কান্নাকাটি করে লাভ নেই। আপনারা শক্ত না হলে বেচারীর কী অবস্থা হবে। দয়া করে জমিরের বউকে ডাকুন। ওনার হাতে ওনার আমানত দিয়ে আমি এই ট্রাকে করেই ঢাকা চলে যাবো। প্লিজ ডাকুন। তাড়াতাড়ি করুন।
এবার জানু নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। কোন ভাবে ঝিম ধরা পা দু'টোকে টেনে সামনে এগিয়ে গিয়ে বললো, আমি **মরু - সাহারার** আম্মু। ওদের আব্বুকি আসেনি?
বিদেশ ফেরা যুবক- না। ভাবী বড়ো দুঃখের বিষয়, আমার ঘনিষ্ট বন্ধু জমিরকে আমি নিয়ে আসতে পারিনি। তবে এ মালামাল, আর এই খামে আপনার নামে তিন লাখ টাকার একটি চেক পৌছে দিতে এসেছি। আপনার আত্মীয়রাতো ঢাকাতেই আমার কাছ থেকে এসব নিতে চেয়েছিলো।
কোম্পানীর আদেশ, আপনাকে ছাড়া কাউকে না দেওয়া। একটি কাগজে আপনার সই লাগবে। যাতে লেখা আছে আপনি সব বুঝে পেয়েছেন এবং তাতে গ্রামের দশজন লোকের সাক্ষীও লাগবে। আমার বন্ধুকে হারিয়ে আমি বড়ো 'সক' পেয়েছি। আসলেই ভালো লোকজন পৃথিবীতে বেশী দিন থাকেনি। আপনাকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে **মরু-সাহারার** জন্য। আপনাকে বাঁচতে হবে ওদের জন্যেই।

জানু কী জানতে চাইছে আর এ যুবক কী সব বলছে! জানু তার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝছেনা। তাই সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে যুবকের প্রতি।
যুবক আবার বলতে শুরু করলো- বেচারা জমির বাড়ীতে আসবে ছুটিতে। সমস্ত মার্কেটিং করা শেষ। পাসপোর্ট টিকেটও পেয়েছে। ছুটির একদিন আগে কোম্পানীর কাজে গিয়ে বিদ্যুতের 'সক্' খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। কোম্পানী আমার দায়িত্বে আপনার হাতে এ সব পৌঁছানো এবং কফিনটি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানোর দায়িত্ব দিয়েছে।

জমিরের সেই বন্ধু জীবন তার কথা গুলো শেষ করতে পারেনি। ততক্ষণে জানু .... না..........বলে এক গগন বিদারী চীৎকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। জমিরের প্রবাসী বন্ধুটি কিংকর্তব্যবিমুঢ়।
জানুর সে অজ্ঞান হবার ঘটনা যেন স্বাভাবিক! কারো সেদিকে বিন্দুমাত্র নজর নেই। ওদের নজর জমিরের মালামালের প্রতি। তিনলাখ টাকার চেকের প্রতি। ওরা তাই জোঁকের মতো লেপ্টে থাকে জমিরের প্রবাসী বন্ধু জীবনের পিছু। যে ভাবেই হোক ওসব উদ্ধার করতে হবে! জানুর সে অজ্ঞান দৃশ্য দেখে জানুর খালু দ্রুত জানুকে কোলে তুলে ঘরে নিয়ে যায়। বলতে থাকে- কেউ একজন পানি দিন.....পানি ....পানি........।।
অভীক.কম

রিয়াদের টিউশন নির্ভর বাংলা স্কুল

আমরা যারা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে প্রবাসী। বিশেষ করে আমাদের যাদের সন্তানরা স্বদেশের আলোহাওয়া এবং আপন ভাষা-সংস্কৃতির বাহিরে গড়ে উঠছে। তাদেরকে নিয়েই থাকতে হয় আমাদের সীমাহীন উৎকণ্ঠায়। ভিন্নভাষা সংস্কৃতির মাঝে গড়ে উঠা এ প্রজন্মকে সঠিক দিক নির্দেশনা, জাতির সঠিক ইতিহাস শেখাতে আমাদের হিমশিম খেতে হয় প্রতিনিয়ত। বাচ্চাদের বিনোদনের এখানে কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। কেননা তারা এখানে স্বদেশের মতো মুক্ত-স্বাধীন নয়। বাসা থেকে স্কুল, এবং স্কুল থেকে বাসা। তাদের বিনোদন বলতে যা বোঝায় তা হলো টিভিতে বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো। এই আকাশ সংস্কৃতির ডামাডোলে অবগাহন করেই এদের তুষ্ট থাকতে হয়। এরই মাঝে যে সকল ছেলেমেয়েরা লেখা পড়ায় কিছুটা ভালো করছে তার মানে এই নয় যে সে ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে মেধাবী।

আমি কথা বলছি রিয়াদের প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির একমাত্র সবে ধন নীলমনি বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ নিয়ে। আমাদের স্কুল অভিভাবকদের মাঝে যাদের বিভিন্ন আয়ের উৎস বেশ মোটা তারাই একমাত্র পারেন তাদের সন্তানদের জন্যে স্কুলের শিক্ষক রেখে প্রাইভেট টিউশানীর ব্যবস্থা করতে। প্রতি বিষয়ে টিউশান পেতে একজন শিক্ষককে দিতে হয় প্রতিমাসে ৪ থেকে ৫শত সউদী রিয়াল। তারা সপ্তাহে দু'তিনদিন আসেন একঘন্টার জন্যে শিক্ষা দিতে। এমনিভাবে একজন শিক্ষক মাসে আয় করেন বাংলাদেশী মুদ্রায় লক্ষাধিক টাকা।

টিউশান নির্ভল এই স্কুলটিতে আমার মতো যারা 'হ্যান্ড টু মাউথ' শ্রেণীর অভিভাবক তারাও বাধ্য হয়ে (!) চেষ্টা করেন তার নিজ বাচ্চাদের এমনি টিউশান দিতে। কেউ পারেন আর কারো পক্ষে মোটেই সম্ভব হয়নি। যাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি তাদের সংখ্যাটাই শতকরা ৭০ থেকে ৮০ভাগ। এদের সন্তানগনই স্কুলের অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত, এমনকি বিভিন্ন অনিয়মের শিকার। অথচ যে শতকরা ২০/৩০জন স্কুলের সকল সুবিধাভোগী তারাও সুবিধাবঞ্চিত ৭০/৮০ ভাগ অভিভাবকের মতোই একই হারে স্কুলের মাসিক টিউশান ফি প্রদান করেন। তারপরও এই অসহ্য অনিয়মই নিয়মে পরিণত হয়েছে এখানে।

অথচ একজন স্বল্পআয়ের স্কুল অভিভাবক তার বাচ্চাদের ভরনপোষণ, স্কুলের শিক্ষা সামগ্রীর খরচসহ নিয়মিত দেয় স্কুলের মাসিক টিউশান ফি দিয়ে, বিদেশের নানাবিধ ঝামেলা চুকিয়েই তিনি হাফিয়ে উঠেন। স্বদেশে পাঠানোর মতো তার হাতে থাকে না কোন অর্থ। স্বদেশেও থাকে তার জন্যে অপেক্ষায় কাতর অনেক স্বজনরা। তারা বাচ্চাদের প্রাইভেট টিউশান দেবার (তাও আবার অবশ্যই স্কুলের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক হতে হবে !) কথা ভাবতেই পারেননি। আর এই অনিয়মটিই নিয়ম হিসেবে চলে আসছে দীর্ঘকাল থেকে। এই বিষয়টি আরো পাকাপোক্ত হয়েছে শুধুমাত্র ২০/৩০জন স্কুলের প্রভাবশালী গার্ডিয়ানের সহযোগীতায়।

এসব বিষয়ে কথা বলতে গেলে শিক্ষক কর্তৃক গার্ডিয়ানগন সরাসরি তিরস্কৃত হন, ধিকৃত হন, অপমানিত হন!! এবং তাদের বাচচাদের কপালে এঁকে দেয়া হয় স্থায়ী রাহুর তিলক! নিয়ম বহির্ভূত হলেও আমরা দীর্ঘকাল ধরে স্কুলে 'হাউজ ওয়াইফ' দিয়ে শিক্ষকতার কাজ চালিয়ে আসছি। অথচ আমরা খরচের লাগামটি টেনে ধরার জন্যে যে কাজটি করেছি এখন তা হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েছে! তাই এখনই

আবার এ বিষয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করা দরকার বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। স্কুলের ৬৫০জন গার্ডিয়ান প্রকৃত অর্থে স্কুলের মালিক হয়েও স্কুলের কাছেই জিম্মি হয়ে পড়লেন! এই জিম্মি দশা থেকে তারা মুক্তি চান। তারা চান এই রাহুর কবল থেকে তাদের বাচ্চাদের এবং স্কুলটিকেও মুক্ত করতে।

গত বছর ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর সাহেদা ওবায়েদ এসেছিলেন আমাদের এই স্কুলটি পরিদর্শনে। তিনি এখান থেকে একটি পরিস্কার ধারণা নিয়ে গেছেন। তিনি সেদিন উপস্থিত শিক্ষক অভিভাবকদের উপস্থিতিতে স্কুল মাঠেই আয়োজিত একটি সভায় পরিস্কার বলে গেছেন যে, 'শিক্ষকতার মহান পেশার কথা আপনাদের মনে রাখতে হবে। শিক্ষকদের মাঝে কোন গ্রুপিং বা দলাদলি কোনভাবেই সহ্য করা হবে না'...। অথচ আমাদের শিক্ষকগন ঠিক তা নিয়েই বেশ মেতে আছেন। আমরা বিশ্বাস করি সে সম্পর্কে বাংলাদেশ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রফেসর সাহেদা ওবায়েদের কাছেই বিস্তারিত জেনেছেন। প্রফেসর সাহেদা ওবায়েদকে অত্র স্কুলের টিউশান নির্ভরতার উপর আলোকপাত করলে তিনি জানান, যেহেতু স্কুলটি গার্ডিয়ান কর্তৃক পরিচালিত স্কুল, ঠিক গার্ডিয়ানগনই এর প্রতিকার করতে পারেন এবং সঠিক পদক্ষেপটি নিতে পারেন। তাদেরকেই সচেতন হতে হবে সবচে' আগে।

আমাদের একটি বিশেষ দাবী পরবাস সমাবেশ রিয়াদ ইউনিট এর পক্ষ থেকে রিয়াদের বাংলা স্কুলটির ৬৫০জন গার্ডিয়ানের প্রাণের দাবী শিক্ষা অদিপ্তর এবং সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে পৌছাতে চাই, আমাদের স্কুল এবং কলেজটিকে ডিগ্রি পর্যায়ে উন্নীত করা হোক। এতে ইন্টারমেডিয়েটের পরপরই বাচচাদের দেশে পাঠিয়ে যে টেনশানযুক্ত হয়ে পড়ি, তা থেকে আমরা মুক্তি পাই। আশা করি যথাযথ কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রা**ণের দাবীটির প্রতি** একটু সুনজর দেবেন।

গত ০৯ফেব্রুয়ারী ২০০৬ অত্র স্কুলের অভিভাবক দিবসে বিপুল ভোটে নবনির্বাচিত স্কুল পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী জনাব সালেহ সিদ্দিকী তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে আমাদের অসহায় গার্ডিয়ানদের কিছুটা পূর্ব সংকেতের আলোকরশ্মি দেখালেন। তিনি বললেন, স্কুলের পড়া স্কুলেই শেষ করার তিনি ব্যবস্থা নিতে যাচেছন। শোনে খুবই ভালো লাগলো এবং চমকেও উঠেছি বটে। এ প্রসঙ্গে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে একটি প্রশ্ন বেরিয়ে আসে, আদৌ কি তিনি পারবেন এই প্রথা চালু করতে? তবে এও বলা যায় পৃথিবীতে অসম্ভব বলতে তো এখন আর কিছু নেই। ওনি যদি এমনি শুভ পদক্ষেপ নেন তবে তার সঙ্গে থাকবেন অবশ্যই বঞ্চিত শতকরা ৮০জন গার্ডিয়ান। আর তাতে অশুভ শক্তিগুলো পালাতে বাধ্য। এই অশুভ শক্তির পায়তারাতেই আমাদের সন্তানরা সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচেছ। বর্তমান পর্ষদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই, মনে রাখবেন, আপনারা যখন নির্বাচনোত্তর স্কুলের দায়িত্বটি কাঁধে তুলে নিয়েছেন তখন স্কুলটি সম্পূর্ণ তথৈবচ অবস্থায়। একে একটি সুশৃংখল অবস্থায় ফিরিয়ে আনা এখন আপনাদের দায়িত্ব। কাজটি অত্যন্ত কঠিন হলেও পদক্ষেপটি আপনাদেরই নিতে হবে। যেহেতু সাধারণ সংখ্যাগুরু গার্ডিয়ানদের সরাসরি ভোটে আপনারা নির্বাচিত তাই কোনভাবেই দায়দায়িত্ব আপনারা এড়িয়ে যেতে পারবেন না।

আমি দীর্ঘ ২২বছর যাবৎ রিয়াদের এই স্কুলটির প্রতি গভীরভাবে নজর রেখে আসছি। এ এক বিশাল সম্ভবনাময় স্কুল। যে স্কুলে পরীক্ষায় পাশের হার মুখ্য না হয়ে দেশের যে কোন সেরা স্কুলের চেয়েও সেরা শিক্ষাদান হতে পারে মুখ্য; এবং সেরা নাগরিক উপহার দিতে পারে আমাদের এই অভাগা জাতিকে। এখানে নির্দ্বিধায় বলা যায় স্কুলটি একটি নকল মুক্ত স্কুল। যেখানে বাচ্চাদের রুট হচেছ ঘর থেকে স্কুল এবং ঘরে ফিরে আসা। বই হচেছ তাদের নিত্য দিনের সঙ্গী। যারা জানে না প্রতারণা, মিথ্যা এবং ছলচাতুরী। তারা নকল কীভাবে করে তাও জানে না। দেশীয় আবহাওয়ায় গড়ে উঠলে হয়তোবা তারা সেই কুশিক্ষাটিও রপ্ত করতে পারতো। কিন্তু তারা গড়ে উঠছে বিদেশে একটি আবদ্ধ পরিবেশের একুইরিয়ামে। তারা ইন্টারমেডিয়েট যখন শেষ করে তখনও থেকে যায় প্রকৃত অর্থেই শিশু।

তবে তাদের প্রকৃত এবং সুশিক্ষার জন্যে দরকার যে মালমশলার, তার তীব্র অভাবে এই প্রযুক্তির প্রতিযোগীতার বিশ্বে তারা গড়ে উঠছে অতীব দুর্বল হয়ে। এ বিশ্বে টিকে থাকার মতো এদের মাঝে শিক্ষার প্রোটিনের অভাব অত্যন্ত প্রকট। তাই এরা পরিণত হচ্ছে জাষ্ট একটি এ্যাকুরিয়ামের মাছে। যাকে নদী কিংবা সমুদ্রে ছেড়ে দিতেই নির্ঘাত মৃত্যু। অতএব আমাদের জাতির এই আগামী সূর্যদের এখান থেকে বেরিয়েই যাতে প্রতিযোগীতার বিশ্বে অপমৃত্যু না ঘটে, সে জন্যেই আমাদের বহু কষ্টে উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগই খরচ করা হচ্ছে এদের পেছনে। স্বল্প আয়ের লোক আমরা। আমাদের দেশের উন্নয়নে আমাদের রেমিটেন্স থেকে জাতিকে বঞ্চিত রেখে দেশের আগামী সূর্যদের পেছনে যে পরিমান খরচ করছি, তা যেন 'অপচয়' শব্দে পরিণত না হয় সেটাই আমাদের একান্ত চাওয়া। আমরা প্রবাসী অভিভাবকগন আমাদের সন্তানদের পেছনে বাংলাদেশের যে কোন ষ্ট্যান্ডার্ড স্কুলের খরচের চেয়ে ষোল সতেরগুন বেশী অর্থ খরচ করছি এখানে। তারপরেও কি আমরা এদের জন্যে সবচে' ভালো কিছু আশা করতে পারি না?!

হ্যা আর এ আশায়ই দীর্ঘ যন্ত্রনাময় প্রতীক্ষার পর এবার সাধারণ গার্ডিয়ানগন সরাসরি ব্যালট যুদ্ধে বর্তমান স্কুল পরিচালনা পর্ষদদের জয়ী করেছেন। তাই এ পর্ষদের দায়দায়িত্ব অনেক। স্কুলের ৯৯৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর চরিত্র গঠনে, সুশিক্ষা দানের পবিত্র এবং মহান দায়িত্ব এখন নবনির্বাচিত স্কুল পরিচালনা পর্ষদের ঘাড়ে উপর। এ দায়িত্ব শ্রষ্টা প্রদত্তও বটে। একাডেমিক এবং স্কুলের উন্নয়নের স্বার্থে এখানে 'সীমাবদ্ধতা' শব্দকে অবশ্যই এবার নির্বাসন দিতে হবে। স্কুলটিকে অবশ্যই এবার সকল প্রভাবমুক্ত করতে হবে। 'প্রভাব' শব্দকে কবর দিতে হবে আমারদের সন্তানদের উজ্জল ভবিষ্যত মাথায় রেখেই। মনে রাখবেন পর্ষদে নির্বাচিত হওয়ার আগের দিনও ছিলেন আপনি একজন সাধারণ গার্ডিয়ান, অন্যান্যদের মতো আপনিও যন্ত্রণায় ভুগেছেন আপনার সন্তান নিয়ে। সে কথা মাথায় রেখেই এগিয়ে যাবেন। সাধারণ গার্ডিয়ানগন চান স্কুলটির আমুল পরিবর্তন। কতটুকু করতে পারবেন এমন ভাবনা না ভেবে জাষ্ট উদ্যোগ নিন, শুরু করুন। কতটুকু করতে পারলেন তা সময়ই বলে দেবে।

বর্তমান পর্ষদের যাত্রা শুরুতেই তাদের একটি পদক্ষেপ দৃষ্টি কাড়ার মতো। এবং অভিনবত্বেরও দাবী রাখে। তাহলো স্কুলের সনাতনী নিয়ম ভেঙ্গে সময়ের প্রয়োজনে তা নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাহলো বার্ষিক পরীক্ষায় দু'বিষয়ে অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের পুণরায় সে বিষয়ের পরীক্ষা নিয়ে তাদের প্রমোশান দেয়া। যারা কান্ডজ্ঞানহীন এবং সনাতনী পদ্ধতি আকড়ে ধরে থাকতে পছন্দ করেন হয়তো তারাই এর সমালোচনা করে থাকবেন। বিদেশের এই কঠিন পরিবেশে যেখানে আমাদের বাপদের নুন আনতে ফান্তা ফুড়ায় সেখানে একটি কিংবা দুটি সন্তান যদি বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে যায় এবং তাদের যদি একই ক্লাশে পুণরায় এক বছর থাকতে হয়। তাহলে তাদের মানসিক উদ্দামতা, সুকুমারবৃত্তি নষ্ট হয়ে যাবে।

অন্যদিকে পিতার খরচ করতে হবে একবছরে অতিরিক্ত বিশাল অংকের টাকা। যা রেমিটেন্স হিসেবে দেশে গেলে আমাদের জাতীয় উন্নয়নে একটি বিরাট ভূমিকা রাখতে পারবে। বর্তমান পর্ষদ এইসব চিন্ত াভাবনা করেই শ্যাম-কূল দু'দিকই রক্ষা করতে এই পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন। উলেখ্য এরাই সেই শ্রেণীর অভিভাবক যারা নিজ বাচ্চাদের প্রাইভেট টিউশন দিতে অক্ষম। আশা করি এবং আমাদের বিশ্বাস আমাদের বিদেশের এই সীমাবদ্ধতা ও অসহায়ত্বের প্রতি নজর রেখে বিষয়টি শিক্ষা অধিদপ্তর সহজ ও সুন্দরভাবে গ্রহণ করবেন। এমন একটি অতীব সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ এর জন্য আমরা সাধারণ গার্ডিয়ানগন স্বাগত জানাচ্ছি এবং যুগান্তর পরিবারের পরবাস সমাবেশ রিয়াদ সহ পুরো সউদী আরবের ইউনিটগুলোর পক্ষ থেকে অমর একুশের কৃষ্ণচূড়ার লাল শুভেচ্ছা এবং সাধুবাদ জানাচ্ছি। তবে নতুন পর্ষদের জন্য একটি শব্দ খুবই জরুরী 'সাধু সাবধান'!!

এবার সউদী আরবের বিভিন্ন সিটিতে গঠিত যুগান্তর পরিবারের পরবাস সমাবেশ ইউনিট প্রধানদের উদ্দেশে বলছি, রিয়াদের কেন্দ্রিয় ইউনিটের পক্ষ থেকে সবাই অমর একুশের সংগ্রামী শুভেচ্ছা গ্রহন করুন। আমরা রিয়াদের একটি পাঁচতারা হোটেলে মেঘাসিটি রিয়াদের পরবাস সমাবেশ এবং জেদ্দার ইউনিট সহযোগে একটি পুর্ণাঙ্গা কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করতে যাচ্ছি। আপনারা আপনাদের আহাবায়ক কমিটি ভেঙ্গো একটি পুর্ণাঙ্গা কমিটি গঠন করুন এবং সে কমিটির প্রত্যোক ইউনিট প্রধান সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের সই সহকারে আপনাদের কাগজপত্র রিয়াদে পাঠান। আমরা দৈনিক যুগান্তরের পরবাস সম্পাদক, এবং পরবাস সমাবেশের প্রধান উপদেষ্টা কবি শাকিল মামুদের সমীপে তা পাঠিয়ে দেবো। আমাদের বিশ্বাস তিনি তা অনুমোদন করে আপনাদের পুর্ণাঙ্গা কমিটিগুলো দৈনিক যুগান্তরের পরবাস সমাবেশ এ প্রকাশ করে দেবেন। রিয়াদের কেন্দ্রীয় ইউনিটের সঙ্গো দ্রুত যোগাযোগ করুন। কেননা আমাদের অনুষ্ঠিতব্য অনুষ্ঠানে আপানাদের উপস্থিতি আমরা একান্তভাবেই কামনা করছি। পরবাস সমাবেশ রিয়াদের কেন্দ্রীয় ইউনিটের বিভিন্ন খবরাখবর জানতে এবং আপনাদের পাঠানো লেখাগুলো দেখতে আপনি চোখ রাখুন নিয়মিত মরুপলাশডটকম এ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গঠিত পরবাস সমাবেশ এর বন্ধুদের জানাচ্ছি পুরো সউদী আরবের পরবাস সমাবেশ এর পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান একুশের রক্তলাল পলাশ ফুলের শুভেচ্ছা। সবাই সুস্থ থাকুন। ভালো থাকুন।

১৫এপ্রিল ২০০৬ইং
দৈনিক যুগান্তরের এই শিরোনামে প্রকাশিত
'রিয়াদে বাংলা স্কুলের চালচিত্র'
খবর ডট কম এর শিরোনাম...
'রিয়াদে বাঙালি কমিউনিটির সবে ধন নীলমনি বাংলা স্কুল এন্ড কলেজ'
৩রা এপ্রিল ২০০৬ এ প্রকাশিত।

‘স্বপ্ন নগরী নিউ ইয়র্ক’ উপন্যাস এর উপর কিছুটা আলোকপাত

কথাশিল্পী এম, বাহাউদ্দিনের ***স্বপ্ন নগরী নিউ ইয়র্ক*** উপন্যাসটি **সদালাপ** ওয়েব ম্যাগাজিনের এক চমৎকার উপহার। পাঠকগন তা প্রাণভরে উপভোগ করেছেন সন্দেহ নেই। লেখকের ভাষার কারুকাজ, শব্দশৈলী, বর্ণনার মুন্সিয়ানায় ফুটে উঠেছে, প্রবাসের শেকড়বিহীন মানুষগুলোর বাস্তব জীবনের উপাখ্যান। যারা আমেরিকার স্বপ্নে বিভোর থাকেন সর্বদা কিংবা যারা তয়-তদবীর চালিয়ে যাচেছন নিয়ত সে দেশে যাবার, তারা উপন্যাসটিকে একটি গাইড লাইন বা গাইড বুক হিসেবে পড়ে নিতে পারেন। উপন্যাসটি পড়ে আমার তাই মনে হয়েছে। আমার আরো মনে হয়েছে লেখক উপন্যাসটি লেখার সময় কলমের সঙ্গে অত্যন্ত সৎ ছিলেন।
না। পোষ্ট মর্টেম করার জন্যে আমি উপন্যাসটিকে নিয়ে লাশ ঘরে ঢুকবো না। আমি একটু ভাসমান আলোচনা করবো মাত্র। কেননা আমি একজন ছড়াশিল্পী হয়ে কথাসাহিত্যের আলোচনা আমার সাধ্যের বাহিরে।

এক সময়ের জেদ্দা, সউদী আরব প্রবাসী এম বাহাউদ্দিন প্রবাসের এই ভাসমান মানুষগুলোকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন। কখনো সখনো তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়েছেন। বাস্তবতার চরম কষাঘাতে নিষ্পেষিত হয়েছেন। আর তাতে লেখকের মনোভূমিতে জন্ম নিয়েছে ***স্বপ্ন নগরী নিউ ইয়র্ক*** । এটিকে উপন্যাস না বলে বাঙালি প্রবাসীদের জীবনোপাখ্যানও বলা যায়।

সম্ভবত: উপন্যাসটির প্রথম তিনটি পর্ব প্রকাশিত হবার পর বিশিষ্ট কলামিষ্ট সেতারা হাশেম লিখেছিলেন সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তখন ওনার লেখায় জানতে পেরেছি লেখক এম বাহাউদ্দিন হার্টের সমস্যায় ভুগছেন। তখন থেকেই আমার সিরিয়াস আশংকা ছিলো আদৌ কী আমরা লেখকের কাছে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসটি পাবো? পড়তে পারবো? স্রষ্টাকে এক আকাশ ধন্যবাদ যে তিনি লেখককে সে সুযোগ দিয়েছেন। আমার মতো সাধারণ পাঠকদেরও ভাগ্য সুপ্রসন্ন অবশেষে উপন্যাসটির পুরো স্বাদটি নিতে পারলাম।

দীর্ঘ সময় পরে দুবাই, আরব আমিরাত প্রবাসী ওয়েব ম্যাগাজিন **স্পর্শক** এর সম্পাদক ও বিশিষ্ট লেখক জনাব নুরুলা মাসুম লিখেছেন উপন্যাসটির একটি নাতিদীর্ঘ আবেগপূর্ণ আলোচনা। দু'জনের আলোচনাই ভালো লেগেছে। যে কোনো প্রকাশনাই আলোচনার দাবী রাখে। গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমেই একজন লেখক এবং তার লেখা দিক নির্দেশনা পায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা বড়ো কৃপন।

সদালাপে প্রকাশিত আমার একগুচ্ছ ছড়ার মধ্যে কয়েকটি ছড়ার শব্দ চয়ন নিয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন জনাব এম বাহাউদ্দিন। সেদিনই আমি বোঝতে পেরেছি এ লেখক অনেক অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত মানুষ। আমাদের এই অমানিশাচ্ছন্ন মন-মানসে এবং সমাজে এমন আলোকিত মানুষ খুব বেশী দরকার আজ। লেখকের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ কামনা করি। তাঁর লেখনী আরো শানিত হোক শোষিত মানব কল্যানে।

সদালাপ.কম এ প্রকাশিত এম.বাহাউদ্দিন এর উপন্যাস ‘স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক’ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত।

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ রিয়াদ এর দেয়াল পত্রিকা সমাচার

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, রিয়াদ এ অনুষ্ঠিত সেদিন দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ ও প্রতিযোগিতার কথাই মনে পড়ে গেল। যাতে আমি নিজে মোট ১৩টি দেয়াল পত্রিকাকে নকল দোষে দুষ্ট বলে চিহ্নিত করেছি। সেখানে একটি মেয়ে বাচ্চাকে আমি চিহ্নিত করতে পেরেছি। যে ঠুনকো বাহবা কুড়াবার প্রচেষ্টা অনেকদিন থেকেই চালিয়ে আসছে। দেখেছি গত কয়েক বছর ধরেই সে স্কুলের বার্ষিক ম্যাগাজিনগুলোতে নকল কবিতা দিয়ে আসছে। টিচার বনাম বিজ্ঞ সম্পাদক(!?) অবলীলায় তা প্রকাশও করে আসছেন !? এই বাচ্চা যে দেয়াল পত্রিকার সম্পাদক ছিলো তাতে ছিলো তার নকল লেখা। তারপরও তাকে নাকি পুরস্কৃত করা হয়েছে। এই বাচ্চাকে উক্ত কাজে উৎসাহিত করার জন্যে আপনি কাকে দায়ী করবেন !?....এই বাচ্চার ভবিষ্যতই বা কী... ?!...

অভীক সাহিত্যপত্র। তিনি কবিতা লেখেন। কবিতার ভাষায় কথা বলেন। রোমান্টিক কবি তাহের ম. শায়েখ জেদ্দা প্রবাসী। শীতলক্ষ্যার তরতরে শীতল ধারা বুকে তার বহমান। বর্তমানে তিনি অবস্থান করছেন লোহিত সাগরের পাড়ে। যেখানে রয়েছে সমুদ্রের গর্জন এবং তার উথাল-পাতাল ঢেউ। সমুদ্রের সেই ঢেউই কবিতার ঢেউ হয়ে যাকে প্রতিনিয়তই জাগায়, আবেগ আপুত করে, ভাবায়। তিনি কবি ও সম্পাদক তাহের ম. শায়েখ। যিনি সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা চেতনা থেকে জন্ম দিয়েছেন একটি অনুপম কবিতাপত্র **অভীক**। যা বর্তমানে ইন্টানেট সংস্করণেও রয়েছে। যেদিন সুশোভিত একটি বড় খামে করে আমার কাছে উড়ে এলো **অভীক**। খামটি খুলেই মুগ্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে থাকি কিছুক্ষণ। তারপর নতুন প্রকাশনার সুগন্ধ শুঁকে শুঁকে যখন মন প্রাণ ভরে উঠেছে। তারপরই কবির এই নতুন আবিস্কারের দিকে নজর দিই। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে যাই বিরামহীন। সংকলনে কবির বেশ ক'টি কবিতা রয়েছে। রিয়াদের কবি ফিরোজ খান এবং জেদ্দার আর এক কবি হাবিবুর রহমান এর কবিতাও রয়েছে। বলতে শরম লাগে! এই কবি ও সম্পাদক জনাব তাহের ম. শায়েখ আমার একগুচ্ছ ছড়া দিয়েই কেন সংকলনের শুরুটা করেছেন!? তা আমার বোধগম্য নয়।

কবির এই প্রকাশ মানসিকতার জন্যে বিশেষ করে প্রিন্ট করা যা এখানে রীতিমতো ঝুঁকিপূর্ণ অবশ্যই। তারপরও তিনি তা করেছেন। তাতে ধন্যবাদ দিতেই হয়। তিনি সাধুবাদও পাওয়ার দাবীদার। পাঠকগন বিশিষ্ট লেখক ও কলামিষ্ট নরুলাহ্ মাসুমের ওয়েব ম্যাগাজিন **স্পর্শক** থেকে কবি তাহের এর **অভীক** সংকলনটি পড়ে নিতে পারেন। তাতে সাহিত্যপ্রেমী পাঠক-পাঠিকাগন অবশ্য তৃপ্তি পাবেন বলেই আমার মনে হয়েছে।
বাঙলা নববর্ষ ১৪১২ এর যাত্রালগ্নে সবাইর প্রতি থাকলো রক্ত করবী শুভেচ্ছা।

রোদ্দুর নামের সংকলন নিয়ে বিভিন্ন ম্যাগে কথা বললে......

জেদ্দা থেকে আর একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে জনৈক বুলবুলের সম্পাদনায়। যাতে রিয়াদের লেখকদের কবিতাই সর্বত্র নজরে পড়েছে। এরা কবিতা লিখেন অথচ কোন নিয়মকানুনের বালাই নেই তাদের লেখায়। পড়াশোনাহীন রুগ্ন মানসিকতার এই লেখকদের হাতেই সুন্দরী কবিতারা হর-হামেশা ধর্ষিত হচ্ছে। **সুন্দরী কবিতারা হচ্ছেই ধর্ষিত !!** শিরোনামে আমার একটি ছড়া (মুলত এই শ্রেণীর লেখকদের নিয়েই লেখা) ছড়াটি পড়ে রিয়াদের সেরা রসিকজন ড. আরিফুর রহমানের মত পন্ডিত ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার ভাষায় - 'শরীয়া কোর্টে এই সুন্দরী কবিতা ধর্ষকদের বিচার হওয়া উচিত'.......।
সেদিন এখানকার একজন নীরব কবি সে সংকলনটি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেন-ভাই এটা অবশ্যই পড়বেন। সংকলনটি দেখে এবং পড়ে বরাবরের মতোই গতানুগতিক মনে হয়েছে। তাতে আহামরি কিছু নেই। তাই আলোচনার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তবে সংকলনটিতে সবচে' যেটা আমার কাছে বেশী দৃষ্টিকটু মনে হয়েছে। তাহলো **মরুপলাশ** সাহিত্যপত্রের সম্পাদকীয় উপদেষ্টা একজন কবি ও প্রাবন্ধিক, একজন গবেষক, একজন ইন্টান্যাশনাল ফিগার, আমেরিকাতে যিনি একটি বিখ্যাত কলেজের প্রফেসর ড. এ-কে আব্দুল মোমেন। তাঁর অনুমতি ছাড়াই এবং আমার সঙ্গেও কোন যোগাযোগ না করে সেই অখ্যাত লেখক-সম্পাদকের অখ্যাত সংকলনে ড. মোমেনকে আমেরিকার (!?) প্রতিনিধি বানিয়ে সস্তা মানসিকতার পাঠকদের সস্তা বাহবা কুড়াতে অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। রাম রাম!!
রোদ্দুর সংকলনের সম্পাদক এবং এর সঙ্গে সংশিষ্টদের মাঝে রিয়াদের বাঙালিদের বাংলা **স্কুলের দেয়াল পত্রিকা**য় লেখকদের মানসিকতার হুবহু ছায়া খুঁজে পেয়ে ভীষণ কষ্ট পেলাম। এতে আমার নিন্দার ভাষাও হারিয়ে ফেলেছি। তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে সে আশায়ই থাকলাম। **মরুপলাশ** বাঙলা নববর্ষ সংখ্যা পড়ার আমন্ত্রণ দিয়ে পাঠকবন্ধুদের জানাই বাঙলা নববর্ষ ১৪১২ এর কচিপলব শুভেচ্ছা।
তারিখঃমে ১০, ২০০৫ইং।

****

(আমার এই লেখাটি প্রকাশের পর হঠাৎ করেই জেদ্দার আকাশে উদয় হলেন লেখক আবুল বাশার বুলবুল। অসৌজন্য আর কটাক্ষের যত শব্দ আছে সবই তিনি তার লেখায় প্রকাশ করেছেন। তাতে আমি নাখোশ না হয়ে খোশই হয়েছি। তবে আমি যে শব্দ দুটির জন্য জনাব বুলবুলকে আমাদের ছড়াকারদের কাঠগড়ায় সারাজীবনের জন্যে দাঁড় করালাম... তাহলো তিনি তাচ্ছিল্যের স্বরে বলেছেন (সকল কবিগন হচ্ছেন **ঈগল** সেখানে ছড়াকারগন শুধুমাত্র **টুনটুনি**।) **বেশ ভালো কথা, তবে তিনি (কুলবুল) কিন্তু বলেননি তিনি কোন প্রজাতির লেখক!!??**

পরের ধরে পোদ্দারী

রিয়াদের বাংলা স্কুল কর্তৃক প্রকাশিত তাদের বার্ষিক প্রকাশনা স্কুল ম্যাগাজিন **প্রতিপ্রভা** নিয়ে আজ কিছু কথা বলতে হচ্ছে অনিচ্ছা সত্বেয়। অনিচ্ছা এ জন্যই যে, সেই ১৯৯৭ সাল থেকে এই সকল জ্ঞানপাপীদের বারবার আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে গিয়েছি। তাতে কোনই কাজ হয়নি। আমার প্রথম ছড়াগ্রন্থ **কিচিরমিচির** যা প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৮৯সালের একুশের বইমেলায়। গ্রন্থখানি পুণরায় ইন্টানেট সংস্করণ মরুপলাশ.কম এ প্রকাশের পেছনে যে কারণটি আমি সংক্ষিপ্তাকারে পাঠকদের বলেছিলাম গত লেখায়। সেখানে ২০০৫স্থলে ১৯৯৫ লিখেছিলাম। এমন একটি 'প্রুফ মিসটেক' এর জন্য দুঃখিত। সেই লেখাটি প্রকাশের পর আমাদের প্রায় শ'দুয়েক মরুপলাশপ্রেমীক পাঠকগন আমাদের মেইল করেছেন, **মরুপলাশ** এর আগস্ট'৯৭ প্রতিবাদ সংখ্যাটি পুণঃপ্রকাশ করার জন্যে।

সুপ্রিয় পাঠক চলুন রিয়াদে বাংলা স্কুলের সদ্য প্রকাশিত তাদের ম্যাগাজিন **প্রতিপ্রভা –২০০৫** সম্পর্কে পুণরায় একটু ঘুরে দাঁড়ানো যাক। ম্যাগাজিনটি ২০০৫সালের হলেও প্রকাশিত হয়েছে মার্চ ২০০৬সালে এসে। এতে আমার নজরে এসেছে বন্ধুবর ছড়াকার আশরাফুল মান্নান এর '**শিশুদের দিনকাল'** ছড়াগ্রন্থের একটি ছড়া। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৮৬ইং। গ্রন্থে ছড়াটির সংকলনভূক্ত তালিকা হচ্ছে ২১নম্বরে। বন্ধুবর আশরাফুল মান্নান এর গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হয়েছে তা ছিলো ১৯৮৬সাল। রিয়াদের বাঙলা স্কুলের যে বাচ্চাটি সেই ছড়াটি তার নিজের নামে দিয়েছে, আমি নিশ্চিত তখন এ বাচ্চাটির জন্ম ও হয়নি। বর্তমানে **শিশুদের দিনকাল** ছড়াগ্রন্থের একটি ইন্টারনেট সংস্ককরণ রয়েছে www.marupalash.com এ।

এমনি চলে আসছে আমার প্রথম নজরে পড়া সেই ১৯৯৭ সালের **বার্ষিকী'৯৭** থেকেই। তা ছিলো স্কুলের তৃতীয় প্রকাশনা। সেই বার্ষিকী'৯৭ তে ছিলো আমার দু'টি ছড়া এবং ছড়াকার আশরাফুল মান্নান এর একটি ছড়া। ছড়াকার আশরাফুল মান্নানের সেই ছড়াটি **মরুপলাশ** এর বাংলাদেশ সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিলো। মরুপলাশ তখন সঙ্গে সঙ্গেই একটি প্রতিবাদ সংখ্যা প্রকাশ করেছিলো সেই ১৯৯৭ সালে। তখন যদি সম্পাদক তথা সম্পাদনা পরিষদ সচেতন হতেন কিংবা মরুপলাশ এর সেই প্রতিবাদ সংখ্যাটিকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের বাচ্চাদের প্রতি মনোযোগী হতেন। তাহলে বাচ্চাদের মনোজগত কিছুটা হলেও সৃজনশীলতায় গড়ে তোলা সম্ভব হতো।

অথচ আজ কী দেখতে পাচ্ছি **বাচ্চাদের শিখতে সুযোগ করে দেয়া হয়েছে কীভাবে পরের ধরে পোদ্দারী করা যায়!!!** এখানে সম্পাদক এবং সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদনার মতো দুরুহ কাজটিতে পুরোমাত্রায় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। এতে বারবারই স্কুলের ইমেজটিই বিনস্ট হয়েছে। ওদিকে যাঁদের লেখা 'রিপ্রিন্ট' হয়েছে তারাও 'প্রেস ল' এর আশ্রয় নিচ্ছেন বলে জেনেছি। এর থেকে কোনভাবেই সম্পাদক এবং সম্পাদনা পরিষদ তাদের দায়দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।

ভাবতে অবাক লাগে এই সম্পদনা পরিষদের কেউ কেউ আবার **'বছরের সেরা শিক্ষক'** হিসেবে স্কুলের পর্ষদ কর্তৃক পুরস্কৃত হন। সেটা কিসের জন্যে, কোন কোয়ালিটির জন্যে, কোন বিষয়ে পারদর্শীর জন্যে ???!!! তা কিন্তু কোথাও উলেখ থাকেনা। স্কুল পরিচালনা পর্ষদের লোকজনও তার কোন ব্যাখ্যা দেননি। তাই আমরা গোবেচারা গার্ডিয়ানগন বোঝতেই পারি না, কেন হঠাৎ করেই কেউ কেউ এমন বিশেষ

খেতাব ও পুরস্কারটি পেয়ে যাচ্ছেন!!!! বাংলাদেশের সকল জাতীয় পুরস্কারগুলো তো আজকাল নেংটা দলীয়করণ করা হয়েছে। তেমনি এখানেও শ্রেষ্টত্বের প্রশ্নে দলীয়করণই হবে হয়তো।

গতবছর অত্র স্কুলের দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় আমি সম্ভবত ১১কি ১৩টি দেয়াল পত্রিকাকে চিহ্নিত করেছিলাম নকলদোষে দুষ্ট বলে। যাতে দেশের এবং কলিকাতার প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারদের ছড়া বাচ্চারা নিজেদের নামেই দিয়েছে। তাতে আমি স্কুল শিক্ষক, বিচারকমন্ডলী, সম্পাদক তথা সম্পাদনা পরিষদকে সচেতন করার জন্যে একটি ওয়েব ম্যাগাজিনে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা লিখেছিলাম। তার ফলাফলে মজার একটি ঘটনা ঘটলো যে, আমি কেন এবং কোন অধিকারে নকলকে নকল বলে সবাকে সচেতন করে দিলাম এবং সহজ ভাবে বলা যায়, কেন সবার চোখ খুলে দিলাম (?!) তাতেই ওনারা নাখোশ।

আর তাতে ওনারা কী করলেন- জেদ্দা এবং রিয়াদের ক'জন তথাকথিত ভাড়াটে লেখক **(যারা সাহিত্যেরও বেপারী !?)** দিয়ে দু'তিনটি ওয়েবম্যাগাজিন এবং স্থানীয় একটি অখ্যাত কাগজের মাধ্যমে **মরুপলাশ** এবং আমার চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে ছাড়লেন.....!! এই যেখানে অবস্থা সেখানে সত্য বলা যে কী কঠিন, তা দীর্ঘদিন থেকেই আমি তিলে তিলে উপলব্দি করে আসছি। তবুও বলবো-মরুপলাশ এর মূল স্লোগানই হচ্ছে **সত্য ও সুন্দরের নির্ভীক প্রকাশ।** তাই আমাকে যে কোন অবস্থায় সত্য বলতেই হবে। যদিও জানি....সত্য কভূ মিষ্টি নয় / দোয়েল শ্যামার শিসটি নয় / সত্য বলায় কষ্ট হয় / কত্তো শত নষ্ট হয় / তবুওতো আসল নকল / সত্য দিয়েই পষ্ট হয়....।।

একযোগে চারটি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত

***

না ! আর কাহাতক সহ্য করা যায়। সেই ১৯৯৭সাল থেকে শুধু বলেই আসছি, এখানকার স্কুল কর্তৃপক্ষকে, পর্ষদকে না তাতে তারা কোনই কর্ণপাত করেননি। বা এটাও বলা যায় তাদের সাহিত্য সম্পর্কে কোন হুস-জ্ঞান নেই। তাই তাদের স্বেচ্ছাচারিতার বাণচক্র আমার মত একজন সাহিত্যের ক্ষুত্রকর্মীর অস্তি-পঞ্জর চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে বারবারই। তাই এবার দেশের সকল সাহিত্যিক, অগ্রজদের বিষয়টি মরুপলাশ ও বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে জানাতে বাধ্য হলাম। তাতে তৎক্ষনাৎ বাংলাদেশের কয়েকজন লেখকের যে প্রতিক্রিয়া এসেছে...তারা জানিয়েছেন ম্যাগাজিন সম্পাদক ও সম্পাদনা পরিষদের বিরুধ্বে তারা আইনী আশ্রয় নিতে যাচ্ছেন।
.....লেখকের সর্বশেষ মতামত
১৯মে২০০৬ইং

একাত্তরের খন্ড স্মৃতি

তখন কীইবা এমন বয়স। অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে সবেমাত্র ক্লাশ করতে শুরু করেছি। বঙ্গাবন্ধুর ডাকে তখন চলছে সারাদেশে (পূর্ব পাকিস্তানে) অসহযোগ আন্দোলন। মনে হয়েছে যেন তখন বঙ্গাবন্ধুই দেশের সরকার প্রধান। তাঁর কথা মতোই মানে তাঁর আদেশেই চলছে দেশ। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক এবং শিল্প-কারখানা। এক কথায় সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাঁরই কথায়। চাঁদপুর জেলা শহরের পূর্ব পার্শ্বেই ক্ষীণস্রোতা নদী ডাকাতিয়ার উত্তর পাড়ে দক্ষিণ তরপুরচন্ডী নামক ছোট্ট একটি সবুজ গাঁয়ে আমার জন্ম। ছোট্ট জেলা শহরটির (তখন ছিলো মহকুমা শহর) ঠিক মাঝখানেই অবস্থিত আমাদের উচ্চ বিদ্যালয় (গনি মডেল মাল্টিলেটারেল হাই স্কুল।) পায়ে হেটেই স্কুলে যেতাম।

তখনকার চাঁদপুর কলেজ যা বর্তমানে চাঁদপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এর অগ্রজ ছাত্রগন মিছিল নিয়ে আসতেন। এসে আমাদের ক্লাশ থেকে টেনে বের করে নিয়ে যেতেন মিছিলে যোগ দেবার জন্যে। তখনকার কলেজ ছাত্রদের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাদের দু'জনের কথা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে তাঁরা হলেন-জনাব হানিফ পাটওয়ারী এবং ফরিদগঞ্জের কালু পাটওয়ারী (দুঃখিত কালু পাটওয়ারীর প্রকৃত নামটি মনে করতে পারছিনা। তবে এনামেই তিনি তখন চাঁদপুরে খুবই পরিচিত ছিলেন।) হানিফ পাটওয়ারী (আমাদের স্কুলের উত্তর পার্শ্বেই যাদের বাড়ি) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন একটি গ্রুপের কমান্ডার হয়ে বীরত্বের সঙ্গো পুরো নয়টি মাস মুক্তিযুধ্বে তাঁর দলকে পরিচালনা করেন। জেনেছি বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী।

তখন চাঁদপুরে চলছিলো অতিগোপনে স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুতি। তখনকার চাঁদপুর কলেজের অধ্যাপক সৈয়দ আবদুস সাত্তার এবং অধ্যাপক আবদুল মান্নান ছিলেন এর পুরো তত্ত্বাবধানে। চারজন টগবগে তরুণ ছাত্র সুশীল, শংকর, আবদুল খালেক ও আবুল কালাম ভুইঁয়া বোমা তৈরী করছিলো। মুহূর্তের জন্যে ওরা কিছুটা অসাবধান হয়ে পড়লে, ওদের তৈরী একটি বোমাই বিস্ফোরিত হয়। যাতে চার তরুণই ঘটনাস্থলে মারা যায়। সেই চারজন টগবগে তরুণ ছাত্রই ছিলো চাঁদপুর জেলার স্বাধীনতা প্রস্তুতি পর্বের প্রথম শহীদ।

সে কথা আমার "*মোহনার ইতিকথা*" নামক একটি নাতিদীর্ঘ কবিতায় বলেছি প্রায় দেড় দশক পূর্বে। যে কবিতাটি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের পর আমার "*ভালাগে না*" নামক কিশোর কাব্যগ্রন্থেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অথচ ইতিহাস তাঁদের মনে রাখার প্রয়োজনও মনে করে না। কথাগুলো বড়ই আক্ষেপের সঙ্গো উচ্চারণ করলেন সাংবাদিক চুন্নু ভাই। ১৯৯৯ সালের বার্ষিক ছুটিতে স্বদেশে থাকাকালীন চাঁদপুরের সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে কথা হচ্ছিল হাজিগঞ্জের সাংবাদিক ও ছাত্রনেতা মাহবুব আলম চুন্নু এবং অংকুর শিশু বিদ্যালয় এর প্রিন্সিপাল বন্ধুবর আলাউদ্দিন আহমেদ এর সাথে.....।

ঠিক সে সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত আমার বড় ভাই পাকিস্তানের মারী হিল্স ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছুটিতে দেশে এলেন। আর এসেই আটকে গেলেন। বলা যায় বিবেকের কাছে আটকে গেলেন। যদিও একবার তিনি প্রস্তুতি নিয়েছিলেন পাকিস্তান ফিরে যাবার জন্যে। ঠিক এমনি সময়ে লাহোরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত আমার এক মামার একটি ম্যাসেজ বহন করে আনে তখনকার ডাকবিভাগের পোস্টকার্ড। '*না ফিরে নিজ দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকো*'। আর তাতেই তিনি পাকিস্তানে ফেরা থেকে বিরত থাকলেন। নিজ দায়িত্ববোধ থেকেই তিনি চাঁদপুরের লন্ডন ঘাটের পেছনে বালুর মাঠে একটি গাদা

রাইফেল দিয়ে (যা চাঁদপুর থানা থেকে তিনি পেয়েছিলেন) বেশকিছু ছাত্র ও বিভিন্ন পেশাজীবিদের ট্রেনিং দিতে শুরু করলেন। সেখানে আমিও কিছুদিন ট্রেনিং নিলাম। তখন জানতাম যে এ ট্রেনিং দিয়ে এবং ঐ রকমের একটি গাদা রাইফেল হলেই যুদ্ধ করা যাবে। দেশকে স্বাধীন করা যাবে। পরে বোঝেছি তাতে যৎসামান্য আত্মরক্ষা করা ছাড়া যুদ্ধ করা যায় না।

একদিকে মিছিল। অন্যদিকে ট্রেনিং। এমনি মিছিলে-ট্রেনিংএ মুখরিত চাঁদপুর তথা পুরো দেশটা হঠাৎ করেই মৌন-মূক হয়ে গেল। ২৫শে মার্চের কালো রাতে বর্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঝাপিয়ে পড়লো নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর। গনহত্যার মহোৎসবে তারা মেতে উঠলো। শহর ছেড়ে লাখো লাখো মানুষের স্রোত তখন গ্রামের দিকে। নৌ-সড়ক-আকাশ পথ সবই মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে আছে। যানবাহন বলতে কিছুই ছিলো না। সেই কিশোর বয়সে মানুষের দুর্ভোগ দেখে কতবার যে কেঁদেছিলাম তা একমাত্র আলাহ্‌ই ভালো জানে।

একদিন বিকেল তিনটা হবে হয়তো। বাড়ির পাশ দিয়ে হাজার হাজার শহুরে লোকজন পায়ে হেটে যাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। আমাদের বাড়ির দক্ষিন পাশে একটি তালগাছের কাছে এসে এক গর্ভবতী মহিলা হঠাৎ করে ঘুরে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর শোনা গেল চীৎকার। আমি দৌঁড়ে গেলাম। দেখলাম একজন লোক সম্ভবত: মহিলার স্বামী। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তিনি কি করবেন। কোথায় যাবেন। কান্না জড়িত কন্ঠে দিশেহারা। মাত্র দশ-বারো হাত দূর দিয়ে হাজার হাজার নারি-পুরুষ- শিশুরা হেটে যাচ্ছে। অথচ কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। সেই কঠিন সময়টাতে কারো প্রতি কারো ফিরে তাকাবার সময়ও ছিলো না। সে সময়ে সবাই নিজকে নিয়ে ব্যস্ত। চাচা আপন বাঁচার সময়। সবাই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে নিজের জানটি নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে।

আমি ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরে দৌঁড়ে এসে আমার বোনকে বললাম। সে আরও কয়েকজন মহিলা নিয়ে ছুটে গেলো সেই পড়ে যাওয়া গর্ভবতী মহিলার কাছে। সেখানে আমার আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই দূর থেকে দেখলাম আমাদের বাড়ির মহিলারা তিন চারজন তাদের শাড়ির আঁচল খুলে সেই মহিলাকে ঘিরে ধরেছে। বাকি দু'জন সেই মহিলার পাশ ঘেষে বসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই মহিলার একটি ফুটফুটে বাচ্চা হয়েছে। তারপর আমি আমাদের আশে পাশের আরও কয়েকজন মহিলা জড়ো করে পাঠালাম সেখানে। তারা সম্পূর্ণ ব্যবস্থা নিলো।

সেই মহিলাকে আমাদের এখানে দু'দিন রাখলাম। তার স্বামী বেচারা চাকুরীজীবি। শহর ছেড়ে পায়ে হেটে যাচ্ছিলো পোয়াতি স্ত্রী নিয়ে নোয়াখালী। পথিমধ্যে এ ঘটনা। এমনি হাজারো ঘটনা ঘটেছে বাংলার সর্বত্রই তখন। আমি পরে একটি নৌকা দিয়ে যতদূর পারা গেলো তাদের এগিয়ে দিয়ে আসলাম। অবশ্য যেখানে তাদের পৌঁছালাম, সেখান থেকে যান-বাহন হিসেবে অন্তত: রিক্সা পাওয়া গিয়েছিলো। তাদের যাবার একটি ব্যবস্থা করতে পেরে নিজের মনে পরম শান্তি পেয়েছিলাম। *সেই মহিলাটির অবস্থা দেখেই মনে হয়েছে আমাদের পুরো দেশটিও তখন পোয়াতী। সন্তান প্রসব যন্ত্রণায় তখন ছটপট করছে। সে সন্তান দেবে যার নাম হবে বাঙালি জাতি.....।। অবশেষে সে দিয়েছেও তা।*

বাংলাদেশের মানুষের দুর্ভোগ তখন চরমে। তখন আমাদের শ্রষ্টা নীরবে হাসছিলেন বলেই আমার মনে হয়েছে। সেই দুর্ভাগা জাতির দুর্ভোগ আজও শেষ হয়নি। এখনও পদে পদে দুর্ভোগ!! নিয়তি যেন এ জাতির ললাটে দুর্ভোগের স্থায়ী সীলমোহর লাগিয়ে দিয়েছে!।

দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। খবরাখবর জানার জন্যে তখন সবারই সম্বল ছিলো রেডিও। যার মাধ্যমে জানা যাবে দেশে কী হচ্ছে! সে সময়ে রেডিওতে মাধ্যম হয়েছিলো শুধু আকাশ বাণী

কোলকাতা এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও। ঢাকা রেডিও কেন্দ্র যেহেতু পাকবাহিনীদের দখলে, তাদেরকে তো কোনভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। আমার বড় ভাই পাকিস্তান হতে আসার সময় তখনকার দিনে পঁচিশ রুপিয়া দিয়ে খরিদ করে এনেছিলেন একটি ফিলিপ্স রেডিও। পুরো এলাকায়ই ঐ একটি রেডিও ছিলো 'সবে ধন নীল মনি'। যার জন্যে এলাকার প্রায় সবাই এসে জড়ো হতেন আমাদের রেডিওটার পাশে খবরা-খবর জানার জন্যে ।

সেই কিশোর বয়সেই শরীরে স্বাধীনতার জন্যে আবেগের জোয়ার এর কোন অন্ত ছিলো না। তখনও আমার জানা ছিলো না, স্বাধীনতার জন্যে এতো ত্যাগ এবং এতো রক্ত ঝরাতে হয়। এতো নির্যাতন ভোগ করতে হয়। মা-বোনের এমন পাইকারীভাবে ইজ্জত হারাতে হয়।! জানা ছিলো না আমাদের দেশের কিছু লোকেরা নিজ দেশটার সঙ্গো গাদ্দারী করবে। নিজেদের মা-বোনের ইজ্জতের সঙ্গোই বিশ্বাসঘাতকতা করবে। ওরা স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি। পাকিস্তানের দালাল, চাটুকার। যাদের চরিত্রের আজও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। যদিও তাদের সীমাহীন সৌভাগ্যের ফলেই পেয়েছিলো সাধারণ ক্ষমা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে। সে ক্ষমার মর্যাদা কি তারা রক্ষা করেছে ?

বার বার বঞ্চনার শিকার হয়ে নিজ দেশেই যখন মানুষ পরবাসী হয়ে যায়। পেছনে যেতে যেতে যখন মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়। শুধু তখনই আত্মরক্ষার জন্যে সে প্রথমে প্রতিরোধ করবে। যদি তাতেও জীবন বিপন্ন হতে থাকে। তখন প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হবে। আমাদের জন্যেও সেই সময়টি এসেছিলো একাত্তরের দিনগুলোতে। আমাদের ঘাড়ে একটি অসম যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো। অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত একটি নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গো আমরা যুদ্ধে নামলাম গাঁইতি-শাবল-টেটা-যুঁতি-দোনালা বন্দুক আর দু'চারটা গাদা রাইফেল নিয়ে।

না। চাঁদপুরের বাড়িতে আর থাকা সম্ভব হলো না। কেন না ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের নাপাকবাহিনী চাঁদপুরে এসে টেকনিক্যাল হাই স্কুলে তাদের স্থায়ী আস্তানা গেড়েছে। বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে। কোন কারণ নেই, কিন্তু নেই। যেখানে সেখানে তারা নিরীহ মানুষদের গুলী করে হত্যা করছে। মনে হচ্ছে যেন তারা পাখি শিকারে এসেছে। কিংবা বন্দুক দিয়ে হাতের নিশানা ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করছে। স্থানীয় আমাদের কিছু স্বজাতি ভাইয়েরা তখন পাকিস্তানী সেনাদের সহযোগীতা করতে শুরু করেছে। তাতে এলাকায় থাকা আরো বেশী বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

আমরা নিজ বাড়ি ছেড়ে (যা জেলা শহরের খুব কাছে) পরিবারের সবাই গ্রামের গহীনে দুরের এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। কিছুকাল যেতে না যেতেই সেখানেও ভয় নিয়মিত হানা দিতে থাকলো। পরে একদিন মা ডেকে বললেন- 'বাজান, তুই যদি এইভাবে গেরামে পইড়া থাহস, তাইলে তোরেও হারাইতে অইবো চোহের সামনে। বড় পোলাডা ছুডিতে আইয়া কোন্ডাই আরিয়ে গেল। আললাহ্ মাবুদ জানে। তুই একটা কাম কর বাপ কারা কারা যেন ইন্ডিয়া যায় টেরেনিং লইতে। তুইও হেয়ানে চইলা যা। তারপর মুক্তি বইন্যা আইসা দেশের লেইগ্যা যুদ্ধ কর। মরতে যদি অয় বাবা তাইলে যুদ্ধ কইরাই মরিস। হেইডাতে দাম আছে। আমি আলাহ্-খোদার নাম জইপ্যা বুহে পাষাণ বাইন্দাই থাহি।

অগত্যা শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে আগ্রহী যারা সেই সব যুবক-কিশোর-মাঝবয়েসীদের সঙ্গো বেরিয়ে পড়লাম ভারতের উদ্দেশ্যে। যাবার সময় মা তার আঁচলের গিট খুলে তার জোলাতি (জমানো) পয়সা মোট সাত টাকা বারো আনা ছিলো সবই দিয়ে দিলেন। সঙ্গো দিলেন কিছু চিড়া এবং আখের গুড়। বলা যায় একটি দেশ ছেড়ে অন্য একটি দেশে যাবার সম্বল ঐ-ই ছিলো যা আমার মা পুটলি বেঁধে হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

গায়ে জোশের কোন কমতি ছিলো না তখন। বলা যায় হুজুগে বাংগাল। টানা চার পাঁচ রাতের পায়ে হেটে অবশেষে চোত্রাখোলা সীমান্ত পার হলাম। আমাদের গাইডারের নির্দেশে মাঝপথে কোথায় কোথায় যেন কোন নির্জন খা খা করা ভূতুড়ে বাড়িতে আশ্রয় নিতাম। কালো মিশমিশে সেই অন্ধকার ঘরে দিনের সূর্যের আলোর সময়টি পার করতে হতো। সে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। অবশেষে পরম কাঙ্খিত সীমান্ত আমাদের নাগালে এলো। সীমান্ত পার হতেই সমস্ত শরীর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছে। যে যেখানে পারলাম শুয়ে পড়লাম।

রাত তখন বোধ করি দু'আড়াইটা হবে। গভীর অন্ধকার রাত। যেখানে একটু উঁচু জায়গা পেয়ে শোয়ার আরামের জন্যে বালিশের মত মাথা ঠেকিয়ে শুতেই গভীর ঘুমে ডুবে গেলাম। সকালে রোদের তেজে ঘুম ভাঙতেই দেখি সেটি একটি কবর। হায়! খোদা। আসে পাশে চেয়ে দেখলাম ছোট বড় শত শত কবর। একটু দুরেই দেখলাম একটি কবরের পাশে একটি লাশ গায়ের মাংশ ছেঁড়া-ফাড়া অবস্থায় এলোমেলো পড়ে আছে। বুঝলাম লাশটি হয়তো চাপা কবর দেয়া হয়েছিলো আর পাহাড়ি শৃগালেরা ঐ লাশকে তাদের আহার বানিয়েছে। হায়রে! বাঙলার বনি আদম। এদিক ওদিক থেকে দমবন্ধ করা দুর্গন্ধ আসতে থাকে। সীমান্ত পার হওয়া আমাদের দলের লোকজন তখনও সেই শত শত কবরের মাঝেই গভীর ঘুমে অচেতন।

রাত মানেই আমাদের জন্যে তখন ছিলো দিন। ভারতে পৌঁছার পথে বার বারই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। যাতে বার বারই নির্ঘাত মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছি। এখনও বেঁচে আছি সেটা বলা যায় রীতিমতো একটি বিশাল বোনাস। সে বিপদের কারণ আমাদের স্বজাতি ভায়েরা মানে রাজাকার-আল বদর-আল শামস তখন সংখ্যায় এতো বেড়ে গিয়েছিলো যে, তাদের মাধ্যমে পাকসেনাদের ক্যাম্পে খবর পৌঁছে যেত বিদ্যুৎবেগে।

একটি বড় বিল পার হচ্ছিলাম এক কোমর সমান পানি ঠেলে ঠেলে। জলজ উদ্ভিদ আরালির ধারালো পাতায় কেঁটে যাচ্ছিলো পা হতে উরু পর্যন্ত। পঁচা শামুক আর কাটা পাটের ধারালো গোড়ার খোঁচায় পা কেটে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। থামার কোন উপায় নেই। কেননা গাইডারের নির্দেশে ধরে দেয়া একটি ছোট্ট সময়ের মধ্যেই সে স্থান পার হতে হবে নতুবা মহাবিপদ। দেরী হলে পাক-বাহিনীর কিংবা রাজাকারের গুলী খেয়ে জানটাই হারাতে হবে। আমরা একসঙ্গে প্রায় ৭০/৮০ জন কিশোর-যুবক বিল পার হচ্ছি। শত শত লাশ ভেসে আছে। লাশের গন্ধে নাক চেপে ধরেও কোন কাজ হচ্ছে না। লাশ ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি সেই ছেলে যে নাকি মৃত লোকের কথা শুনলেই রাতের ঘুম নষ্ট হয়ে যেতো। কোন কবরস্থানের পাশ দিয়ে দিনের আলোতেও একা চলতে পারতাম না ভয়ে। আর সেই আমি লাশ ঠেলে কোমর পানির বিল পার হচ্ছি। মনে বিন্দুমাত্র কোন ভয়ভীতি কাজ করছে না।

বিল পার হতেই রাতের আঁধারে যে সকল গ্রামবাসী পথের পাশে জগ ভর্তি পানি, রুটি, চিড়া-মুড়ি যার যা ছিলো তাই নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো আমাদের একটু সহযোগিতা করার জন্যে। আর মুখে বলছে ভগবান-ইশ্বর-গড-আলার নিকট দোয়া করি বাজানরা তোমরাই আমাগো আশা। তোমরা যাও টেরেনিং নিয়া ঐ কুত্তাগুলারে মাইরা-খেদাইয়া দেশটা স্বাধীন কর। আমাগোরে একটু শ্বাস নিবার দাও.....। কোন রকমে বাইচ্যা থাকার একটু ব্যবস্থা কইরা দেও.....। আহ্ তাদের সেই আন্তরিকতার মাঝে সেদিন কোন ঘাটতি ছিলো না। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ওদের মতো গ্রামবাসীরাই এমনিভাবে নয়টি মাস মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। দেশবাসীদের সহযোগীতাতেই সেদিন মুক্তিযুদ্ধ এত শক্তিশালী, এত অপ্রতিরোধ্য হয়েছিলো। তাতে দিকে দিকে পাকসেনারা হতে থাকলো নাজেহাল, পর্যুদস্ত এবং ভীত-সন্ত্রস্থ।

মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীকে আরও প্রাণ চাঞ্চল্যে, সাহসে উজ্জীবিত করে রেখেছিলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটি যিনি সদ্য প্রয়াত এম, আর আখতার মুকুল ভাই। তিনি তাঁর রচিত ও কথিত *চরমপত্র* টি দিয়ে আমাদের তথা পুরো দেশবাসীকে সাহসে, নব নব উদ্দীপনায় বুক ভরে রেখেছিলেন। তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্যে আর একটি মুক্তিযুদ্ধের প্রামান্য দলিল গ্রন্থ '*আমি বিজয় দেখেছি*'। যে গ্রন্থ আমাদের ভুলে যাওয়া পথঘাট বারবারই দেখিয়ে দেবে অত্যন্ত বিশ্বস্থতার সঙ্গে। মনে করিয়ে দেবে ভুলে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধের সঠিক কথাগুলো। অথচ তিনিই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন পরপারে, ঝরে গেলেন নিদারুণ অনাদরে, অবহেলায়। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ও মাগফেরাত কামনা করছি।

স্বাধীনতার মাস মার্চে০৬ দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত
খবর.কম

হতাশার অন্ধকারে আলোকিত সংবাদ

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, রিয়াদ এর ৫২ জন ছাত্রছাত্রীকে মরুপলাশ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন, যারা এবার এস এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

রোল ৯৫০০৫১ হইতে রোল ৯৫০১০২ পর্যন্ত মোট ৫২ জন ছাত্রছাত্রী এবারের এস এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অত্র স্কুল হতে সবাই পাশ করেছে। পাশের হার শতকরা একশ' ভাগ।

এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩জন। তারা হলো- আবদুল মুহিদ, আবুল বাশার, আয়েশা আক্তার, সুমাইয়া উদ্দিন, ইমেরাল উপমা বৈদ্য, সোমা আহমেদ, তাসলিমা সুলতানা লিমা, জাবির মোঃ সালেহ্, মোঃ খালিদ খান, আবদুল আহাদ, মোঃ সোলাইমান খান এবং শেখ ইমরান আলম, ফাহমি বিন মালেক।

জিপিএ ৪ - ৪.৯৪ পেয়ে পাশ করেছে মোট ৩০জন। তারা হলো- শারমিন মনোয়ার, আহমেদ সাইদ, মোঃ মাহফুজ হোসাইন, জানিজ হোমাইরা, ফাতেমা বেগম, রেহনোমা মাহজাবিন চৌঃ. সুমাইয়া আক্তার সাদিয়া, নুসরাত শারমিন, জিনাত সুলতানা, রেহেনা আক্তার, শারমিন হোসাইন, সালমা পারভিন তানিয়া, রফিকুল ইসলাম, মালিহা ওয়ারদা, হোমাইরা আবদুল হান্নান, মরিয়ম হোসেন, সোমাইয়া জাফরিন চৌঃ, নাজমুল ইসলাম, মাহিদুর রহমান খান, আবদুল আজিজ, শামীম উদ্দিন, শফিকুল আলম চৌঃ, এইচ, এম, রাশেখ খান, মোঃ ইকবাল, মোঃ মিজানুর রশিদ, আহমেদ সাইদ, নিপা মোনালিসা, লাকী আক্তার, সুলতানা ফরিদা চৌঃ এবং তানভীর সিদ্দিকী।

জিপিএ ৩.৫ - ৩.৮৮ পেয়ে পাশ করেছে ৯জন ছাত্রছাত্রী। এরা হলো- মেহেদী হোসাইন সরকার, সোমাইয়া খোয়াজ, আবদুল আজিজ, মোঃ জুয়েল, ফাহমিদা ফারহানা নুর, ফাহমিদা হক, কামরুজ্জামান সৌরভ, আয়মন মোসলেহ, জবির আলম চৌঃ।

বিদেশে বিশেষ করে এই মক্কা-মদীনার দেশে বেড়ে উঠা আমাদের এই প্রজন্মের সম্পর্ক শুধুমাত্র বইয়ের সঙ্গে। যারা মুক্ত পাখির মতো উড়ে বেড়াতে পারে না। সে সুযোগও নেই এখানে। বিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধাও নেই তাদের। যারা দ্বাদশ শ্রেণী অতিক্রম করেও বাস্তবে শিশুই রয়ে যায়। সেই তারাই ঢাকার কোন প্রথিতযশা স্কুলের মতো শতকরা একশ'ভাগ শুধু পাশই করবে না, জি পি এ -৫ পেয়ে পাশ করে স্কুলের এবং পিতামাতার মর্যাদা উন্নত করবে। এমন আশাই আমরা অভিভাবকগন করতে পারি। আমাদের এই স্কুলের জন্যে তেমন একটি অনিন্দসুন্দর শিক্ষার পরিবেশ তৈরীতে আসুন দলমত নির্বিশেষে আমরা সবাই এক সঙ্গে কাজ করি।

দৈনিক যুগান্তর
খবর.কম

কয়েকটি চিঠি.......

সদালাপ ওয়েব ম্যাগাজিন সম্পাদক বন্ধুবর আ স ম জিয়াউদ্দিনকে লেখা চিঠি

১লা কার্তিক ১৪১০ বাঙলা
১৬ অক্টোবর ২০০৩ ইং
রিয়াদ স্থানীয় সময়: রাত ১২:১৯ মি:

সুপ্রিয় সম্পাদক,
'সদালাপ'
সাহিত্য সুহৃদ

আশ্বিনের অন্তিম লগ্নে কার্তিকের প্রথম প্রহরে এই মরুময় দিগন্তে বসে আপনার জন্যে পাঠাচ্ছি হেমন্তের শুভেচ্ছা। আপনার বেশ ক'টি লেখা ইতিমধ্যেই পড়েছি। তবে সম্পাদকের চিরকুটই আপনার সম্পর্কে পাঠকদের একটা পরিস্কার ধারণা দিয়েছে এবং দিয়েছে আপনার সম্পাদকীয় নীতি সম্পর্কে। যাতে সৌজন্যমূলক শব্দ চয়ন, শালীনতাবোধ, পরিমিত আবেগ এবং সুশীল সমাজ গঠনের যে অভিপ্রায় আপনার লেখায় মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে; তাতেই আমি রীতিমতো মুগ্ধ। একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে আমি আপনার ওয়েভ সাইট সদালাপ ডট কম নিয়মিত পড়ি এবং আমার লেখার কিছু মাল-মশলা সংগ্রহ করার চেষ্টা করি। তেমনি আমাদের রিয়াদের এবং 'মরুপলাশ' প্রিয়দের মাঝে ইতিমধ্যেই সদালাপকে পরিচিত এবং জনপ্রিয় করে তুলেছি।

আমাদের ওয়েভ সাইট এ আপনার সদালাপ কে লিংক করে দিয়েছি। এসবই ছিলো আমার নৈতিক দায়িত্ব। এবং একজন ক্ষুদ্র সাহিত্যকর্মী হিসেবে এসব করেই নিজকে ব্যস্ত রাখতে আমি বেশী পছন্দ করি। সাথে তিন কন্যার জনক হিসেবে এবং তারা আমার সাথেই অবস্থান করছে বলে সে দায়িত্ব ও পালন করতে হচ্ছে। তবে সাহিত্য বিষয়টি আমার চরম নেশা যা হিরোইনকেও হার মানায়! তারপর ও যদি আপনার জানতে ইচ্ছে করে বিদেশে কেমন আছি বিশেষ করে এই মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে, তাহলে বলতেই হয়... মরে কিবা বেঁচে আছি / মনে কোন বোধ নেই, / শ্বাস তবু চলে আজো / চোখে কোনো রোদ্ নেই!

আজও একজন লেখক হতে পারছি কিনা জানি না। তবে সুদীর্ঘ তিন দশক এর বেশী সময় ধরে লিখে আসছি নিজের মনের তাগিদে। লেখালেখি ছাড়া আমি কোন কিছুতেই শান্তি পাইনি এবং বলা যায় এতেই রয়েছে আমার জন্যে সতেজ অক্সিজেন!! আপনার সাহিত্যের পাতাটি সমৃদ্ধ করার জন্যে আন্তরিক হতে সবিনয় অনুরোধ করছি। মোলা বাহাউদ্দিনের 'ধ্যান' গল্পটি অনেক পাঠকের ধ্যান ভাঙ্গাতে সাহায্য করবে বলেই আমার বিশ্বাস। আমাদের সমাজের জন্যে একটি চরম সত্যকে এভাবে সাহসীভাবে উপস্থাপন করার জন্যে লেখককে আমার পক্ষ থেকে সীমাহীন ধন্যবাদ দেবেন।

ধর্মনিয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্যে মহানবী (সঃ) আমাদের জন্যে উপদেশ রেখে গেছেন। এতে শুধু রক্তপাতই বেড়েছে যুগে যুগে। লাভ হয়নি কারোই। মতের অমিল ঘটলে প্রয়াত মহান নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী যেমন বলছিলেন পাকিস্থানের শাসকদের উদ্দেশ্যে........ লাকুম দ্বীনুকুম অলিয়াদিন......।। চলুন না আমরাও কোন বাড়াবাড়ির মধ্যে নিজেদের না জড়িয়ে শুধুমাত্র নতুন নতুন সৃষ্টির নেশায় এবং মানব কল্যানে নিজেদের নিয়োজিত রাখি। তাতেই একমাত্র প্রাণের শান্তি আসবে হেমন্তের হিমেল আমেজের মতো। মাফ করবেন আমি নিজেই একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেললাম না তো?

'সদালাপ' এ যাঁরা নিয়মিত লিখছেন সেই সব মহান বিদগ্ধজন, পন্ডিত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। সদালাপ এর নিয়মিত পাঠক শুভাকাঙ্খীদের শরৎ-হেমন্তের শ্বেত-শুভ্র কাশ ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে আজকের মতো এখানেই বাক্যালাপের সমাপ্তি টানছি। সবাই সুস্থ থাকুন। ভালো থাকুন। সন্ত্রাসমুক্ত মনের অধিকারী হবেন সবাই সবুজ ঘাসের মতো এমনি প্রত্যাশায়....

সদালাপ এর কাছে আমাদের প্রত্যাশা

সদালাপ ইতিমধ্যেই সুশীল সমাজ এবং সুশীল পাঠকদের জন্যে একটি শালীনতাবোধের ওয়েব ম্যাগাজিন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আমার মনে হয় এবং একান্ত বিশ্বাস এতে কেউ দ্বিমত পোষন করবেন না হয়তো। ***সদালাপ*** সম্পাদক মুক্ত চিন্তার লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সম্মান প্রদর্শন করে আসছেন জন্মলগ্ন থেকেই। অতএব বলা যায় ***সদালাপ*** সম্পাদক নিজেই একজন সুরুচীবোধ এবং শিল্পবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। যার জন্যে তিনি সুরুচীর কদর করে আসছেন। নিয়মিত চর্চা করে অনেকেই এ ওয়েব ম্যাগাজিনের মাধ্যমে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং হতে যাচ্ছেন। আর এ চর্চার সুযোগটি করে দিয়েছেন ***সদালাপ*** সম্পাদক নিজে।

বিজ্ঞাপন বিহীন একটি ওয়েব ম্যাগাজিন তিনি দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে আসছেন। বিজ্ঞাপন হচ্ছে যে কোন প্রকাশনা, প্রচার মাধ্যমের অক্সিজেন স্বরূপ। আর সে অক্সিজেন ছাড়া যখন তিনি ম্যাগাজিনটি দীর্ঘকাল ধরে রেখেছেন। এর মানেটা হচ্ছে- তিনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। এ বদান্যতার জন্যে মধ্যপ্রাচ্যের বাঙালি লেখকদের পক্ষে এবং ***মরুপলাশ***, ***রূপসী চাঁদপুর*** ও বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম, রিয়াদ এর লেখকদের পক্ষ থেকে ***সদালাপ*** সম্পাদকের জন্যে অন্তবিহীন হেমন্তের শ্বেত-শুভ্র কাশফুলের শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

তবে ***সদালাপ*** এ যে অভাবটি আমাদের পীড়া দেয়, তা হলো সাহিত্যের পাতাটি বড়ো অবহেলিত অবস্থায় মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে আছে। অনুরোধ থাকলো সম্পাদক আ.স.ম জিয়াউদ্দিন ভাই এদিকে একটু শুভদৃষ্টি দেবেন। আরো একটি বিশেষ আবদার - যেহেতু আমি নিজে সুদীর্ঘকাল ধরে শিশু সাহিত্য চর্চা করে আসছি। সে শিশু সাহিত্যের জন্যে চাই একটি আলাদা পাতা। সেখানে শিশুরা তাদের আঁকিবুঁকির সাথে কিছু লেখালেখিও করবে। শিশু - কিশোর উপযোগী বড়দের লেখাও সেখানে থাকবে। আগামীর সুনাগরিক গঠনে লেখকদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এবং সে ভূমিকা পালনে আশা করি ***সদালাপ*** সম্পাদক লেখকদের জন্যে সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন।

সাহিত্য হচ্ছে মুণি-ঋষির সাধনার মতো ধ্যান-মগ্নতা। দেখানোপনা এতে স্থান নেই। তা করতে গেলে ইহার শিল্পবোধ-সৌন্দর্য দুই-ই ব্যাহত হতে বাধ্য। ধান্দাবাজীর ভাইরাসে আক্রান্ত হয়।   বাস্তবে আমাদের চারপাশে আজকাল দেখানোপনাটাই বেশী প্রাধান্য পাচ্ছে। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, হাঙ্গামা করে আর কিছু হলেও অন্তত সাহিত্য হয় না। হাঙ্গামা করে কেউ জীবনে সু-সাহিত্যিক হতে

পেরেছেন বা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তা আমি কস্মিণ-কালেও বিশ্বাস করি না। নিয়মিত পড়াশোনা এবং চর্চায় ইহা অর্জন করতে হয়। কেন না সাহিত্যের নন্দন কানন কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কন্টকাকীর্ণ। এই কন্টকাকীর্ণ পথে হাটতে গিয়ে বার বার রক্তাক্ত হয়েই সাহিত্যের অনিন্দ সুন্দর ফুল ফুটাতে হয়।

...শিখতে যদি জানি / আর লিখতে যদি জানি / দেখবে লুটায় পায়ে পায়ে / সাত সাগরের পানি।...

সবার জন্যে থাকলো হেমন্তের পাকা ধানের সুবাস মাখা শুভেচ্ছা।

ছয় অক্টোবর দু'হাজার চার ইংরেজী।
বাইশ আশ্বিণ, চৌদ্দশ' এগার বাঙলা।

সদালাপ সম্পাদক এবং ভিন্নমত সম্পাদক বরাবরে যে চিঠি লিখেছিলাম সেদিন.....

জনাব সম্পাদক
'ভিন্নমত'
সি সি : সম্পাদক
'সদালাপ'

ওয়েভ সাইটদ্বয়ের সম্পাদকের নিকট আমার কিছু কৈফিয়ত

আপনার ওয়েভ সাইটের বদৌলতে আমার মত সাধারণ পাঠকগন অবশ্যই উপকৃত হচ্ছি। অনেক তথ্য ও তত্ত্ববহুল রচনা পড়ে অনেক কিছু জানতে পারছি। আপনার সবচে' বড় কৃতিত্ব আপনি আপনার ওয়েভ সাইটে অনেক গুনী ও পন্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু ইদানীংকালে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে কিছু অখ্যাত পত্র এবং কলাম লেখকদের সহযোগীতা করে যাচ্ছেন।

জনাব খান সাহেব আমি আপনার একটি লেখা পড়ে যে উপকৃত হয়েছি তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যদি সেটি তথ্য সঠিক হয়ে থাকে (!?) লেখাটির শিরোনামটি ভুলে গেছি। তবে তার গায়ে যে বিষয়ে লেখা ছিলো তা ছিলো ইসরায়েলের অর্থনীতির ভিত্ যে সীমাহীন মজবুত ও পৃথিবীর সেরা। তা আপনার লেখাতেই আমি প্রথম জানতে পারলাম। আমরা সাধারণ পাঠকগন জানি কুদ্দুস খান একজন বিজ্ঞলোক। যিনি ইসলামিষ্টদের জন্যে মাঝে মধ্যেই টলারেন্সের মন্ত্র দান করে থাকেন (!) সে যাক অন্য কথা।

এবার শুরু করছি অনাগত নতুন বছরের রক্তিম শুভেচ্ছা দিয়ে। ভিন্নমতের জন্মলগ্ন থেকেই আমি আপনার ওয়েভসাইটটি পড়ে আসছি। তাতে আমার মনে হয়েছে আপনি একজন সুদক্ষ অর্থনীতিবিদ, যুক্তিবাদী, পরমতসহিষ্নু তথা কোন বিষয়কে অত্যন্ত শালীনতা এবং ভদ্রোচিতভাবে যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে বিশেষণ করে সঠিক সোনাটি বের করে আনেন। আপনার জন্যে তাই আমার শ্রদ্ধাবোধ একঝুড়ি। কিন্তু ইদানিংকালে আপনার ওয়েভে প্রথিতযশা ও বাংলার এক জীবন্ত কিংবদন্তী স্বনামখ্যাত কলামিষ্টকে নিয়ে হই চই দেখে আমি বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছি! আমাদের জীবনবোধ ও জাগরণের গনসংগীত রচয়িতা- আমার ভায়ের রক্তে.....আমি কি ভুলিতে পারি...র শ্রষ্টা জনাব আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর একটি কলাম নিয়ে মুলত: সেই হই চই। স্বদেশের কোন একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সেই কলামটি আপনি আপনার ওয়েভেও পুন:প্রকাশ করেছেন। যদিও সেখানে আপনি উলেখ করেননি তা কোন পত্রিকার সৌজন্যে পুন:প্রকাশিত। যা নাকি হলুদ সাংবাদিকতার দোষে দুষ্ট। এক্ষেত্রে সদালাপ সম্পাদক অবশ্যই ব্যতিক্রম। তিনি লিখেছেন পাঠকদের অনুরোধে অমুক পত্রিকার সৌজন্যে পুন:প্রকাশিত। এ ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার বিশেষ বিধানমতে ইচ্ছে করলেই সেই পত্রিকাওয়ালা আপনার বিরুদ্ধে একখানা মামলা ঠুকে দিতে পারেন।

যাকগে সে কথা। সে কলাম নিয়ে আপনি লিখলেন বেশ বড়-সড় লেখাই। পাশাপাশি আরও দু'একজনেও লিখলেন। তবে তাদের লেখায় শালীনতা, এবং সমস্ত ভদ্রতা ছাড়িয়ে গিয়ে যে সব শব্দ চয়ন করেছে, যা আমার কলমে পুন:উচ্চারণ করা অসম্ভব। সাংবাদিকতা এবং যে কোন লেখালেখির নিয়ম হলো লেখার উত্তর বা প্রতিবাদ লেখা দিয়েই করতে হয়। কিন্তু ভিন্নমত এ প্রকাশিত লেখকদের ভাষা ব্যবহার দেখে মনে হলো ওনারা শালীনতার ধারে কাছেও নেই। সৌজন্যতাবোধতো তাদের অভিধানে আছে বলে মনে হলো না। আমার মনে হয়েছে ওনারা জনাব চৌধুরীকে কাছে পেলে আস্ত গিলে খেতেন। তাদের লেখায় কলম দিয়ে কলমের উত্তর না হয়ে গায়ের জোরটি প্রাধান্য পেয়েছে।

বোঝা গেল লেখকদের মাল-মশলার প্রচুর অভাব (!) জনাব চৌধুরীর বেলায় যে সকল শব্দগুলো ব্যবহার হয়েছে আর যা প্রকাশ করতে আপনি জনাব খান সাহেব সহযোগীতা করেছেন- সে সব শব্দগুলো 'টানবাজারের খান্‌কী-মাগীর' মুখ দিয়েও বের হয় কিনা সন্দেহ। বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন (লেখক +সম্পাদক) আমরা কি জনাব চৌধুরীর মত খ্যাতি, প্রজ্ঞা, ঋদ্ধতার ধারে কাছে পৌঁছতে পারবো আমাদের এক জনমে (?!)

এ কলামকে কেন্দ্র করে ইদানীং আর একজন ছগির আলী খানের জন্ম হয়েছে। আপনার ভিন্নমত এ তার একটি লেখার মধ্য থেকে একটি লাইন দিয়ে সেই লেখাটির শিরোনাম করেছেন। সেই হেড লাইনটি যে কোন প্রকাশনার জন্যে শুধু দৃষ্টিকটুই নয়, অবমাননাকরও বটে। বিশেষ করে ঐ লাইনটিকে হেড লাইন করে আপনি নিজেকে কি চরমভাবে খাটো করেননি? সাথে সাথে আমার মত ভিন্নমতের সাধারণ পাঠকদেরও খাটো করেছেন। তাহলে কি আমরা বুঝবো আপনার সুবুদ্ধির ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে!

আমি মনে করি 'এ্যা বিগ্ লেটার' শিরোনামে সেই গো-বর আর গো-চনা টাইপের লেখাটি এবং নাম-ধামহীন কিছু অশালীন লেখা প্রকাশ করে আপনি খান সাহেব বিতর্কিত হয়েছেন। যদিও আপনি বলে থাকেন মুসলমানদের কোন 'টলারেন্স' ক্ষমতা নেই। সেই টলারেন্স এর আপনি একজন ধ্বজাধারী - তাই কি আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন? জনাব সম্পাদক যদি কেহ আপনাকে মানুষের লজ্জাঙ্গের পশমের সঙ্গে তুলনা করে, তা শুধু আপনার একার অপমান নয়, আপনার ওয়েভের সকল পাঠকেরও। এর জন্যে আমি আপনাকেই দায়ী করবো। একজন দূরদর্শী সম্পন্ন লোকের হঠাৎ এমন অদূরদর্শীতা দেখে আমার নিজের মাথাটাই কাটা যাচ্ছে। ঐ সব কুরুচিপূর্ণ লেখা পোষ্ট থেকে আপনি বিরত থাকলেই আজ এতগুলো কথা বলার প্রয়োজন হতোনা। জনাব সম্পাদকদ্বয়, মনে রাখবেন মধ্যপ্রাচ্যে ইতিমধ্যেই আপনাদের ওয়েভ সাইটগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। অতএব..........

অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি গল্প বলতে হচ্ছে- কিছুকাল আগে আমি 'সদালাপ' এ বাংলাদেশ থেকে প্রচারিত 'চ্যানেল আই' সম্পর্কে লিখেছিলাম। সদালাপের সদাশয় সম্পাদক আমি যেমনি লিখেছি ঠিক তেমনি লেখাটি পোষ্ট করেছেন ওনার ওয়েভে। সেই লেখার কপি আমি চ্যানেল আই এর কর্তৃপক্ষের নিকটও পাঠিয়েছি। যদি তাদের সুমতি জন্ম নেয় সে আশায়। লেখাটির শিরোনাম ছিলো 'চ্যানেল আই এর কর্তৃপক্ষের নিকট মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসীদের কিছু জিজ্ঞাসা'।

সেই লেখার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আজ পর্যন্ত মোট ৩৩টি মেইল আমি পেয়েছি। যার মধ্যে ২৩জনই আমার ঐ সকল বক্তব্যের সঙ্গে একমত প্রকাশ করেছেন। বাদবাকীরা বিরোধীতা করেছেন। তারা হয়তোবা চ্যানেল আই এর দর্শক ফোরামের লোক। সৌদি আরবেতো এখন যারা আদম আর হুন্ডির বেপারী তারাই নিজের দুর্গন্ধ চাপা দেয়ার জন্যে কেউ হয়েছেন প্রতিনিধি আবার কেউ হয়েছেন দর্শক ফোরামের লোক। বাংলা 'চ্যানেল আই' কিন্তু এখন ঐসব শ্রেণীকেই বেশী প্রচার করে ধ্রুপদী, ত্রিপদী, চৌপদীর বিশেষনে

(?!)। ওনারা নিজেদের সাজানো কিছু কিস্‌সা নিজেরা প্রচার করেন। এদেরই কেউ কেউ আপনার ভিন্নমতের তথাকথিত সেই সব লেখকদের মত মেইলে এমন সব ভাষা ব্যবহার করেছেন, যাতে মনে হয়েছে বাংলাদেশের ইক্ষুর মত আমাকে চিবিয়ে রস খাওয়ার জন্যে ওনারা হন্যে হয়ে ঘুরছেন। তাদের সবিনয়ে বলেছি– আপনাদের যা বলার যে সদালাপে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে সেখানেই লিখুন না। **ভিন্নমত** এর কয়েকজন কোষ্ট–কাঠিন্য রোগে আক্রান্ত লেখকের মত ব্যক্তিগত আক্রমনটাই এদের লেখাতেও বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। ভগবান ইশ্বর যীশু আল্লাহই ভালো জানেন– আমরা কবে সভ্য হব (!?)

২৮ ডিসেম্বর ২০০৩

আসুন আমরা বিস্ফোরিত ঘৃনায় এবং প্রতিবাদে ফেটে পড়ি !!

কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা হঠাৎ করেই আমার মাথায় ও শরীরে মধ্যযুগীয় কায়দায় চাপাতী দিয়ে কোপাতে শুরু করলো। মুখে উচ্চারণ করতে থাকলো- **'পাক সার জমিন সাদ বাদ'** এর এবার মজা দেখাচ্ছি। তখন আমার মাথা ও শরীর থেকে ফিন্‌কী দিয়ে গরম রক্ত বেরুচ্ছে। আমি রক্তাক্ত হতে থাকি.............।।

হ্যা ড. হুমায়ুন আজাদের উপর মধ্যযুগীয় ষ্টাইলে বর্বর হামলাটি আমারই উপর হয়েছে বলে আমার মনে হলো। আরও মনে হলো তাবৎ পৃথিবীর সমস্ত কলম সৈনিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি এবং স্বাধীন মতামতের উপর এটি একটি নগ্ন হামলা। ইহা দেশকে মেধাশূন্য করার হামলা। যা সমস্ত বিবেক ও চেতনাকে রক্তাক্ত করে। ড. আজাদ একজন শিক্ষক, সুসাহিত্যিক, একজন মুক্ত চিন্তার ধারক বাহক। যার গ্রন্থের সংখ্যা ষাটের অধিক। **'পাক সার জমিন সাদ বাদ'** গ্রন্থটি একটি প্রতীকি উপন্যাস। যাতে স্বাধীনতা বিরোধীদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন ড. আজাদ। তাঁর উপর হামলা মানেইতো সমগ্র লেখক সত্ত্বার উপর হামলা। সমগ্র শিক্ষক সমাজের উপর হামলা। তারপরও আমরা আমাদের লেখক সত্ত্বাকে জাগিয়ে তুলতে পারছি না কেন? কেন গর্জে উঠছি না?! আমাদের পীঠতো দেয়ালে ঠেকে গেছে। কেনইবা সবাই একসঙ্গে গগনবিধারী চীৎকারে বলছি না - আমরা এ হামলার তীব্র প্রতিবাদ করি। আমরা ঘৃনা করি। ঘৃনা করি। অনিয়মের স্বর্গরাজ্য থেকে আমরা মুক্তি চাই।

দেখানোপনায় আজকাল ভরে গেছে আমাদের চারপাশ। যারা ঘটনা ঘটিয়েছে এবং যারা ওদের সহযোগী মিনি পর্দায় প্রচারের জন্যে ওরাও প্রতিবাদ সভা - মিছিল করছে। সাধারণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানোর ওদের প্রানান্তকর চেষ্টা চোখে পড়ার মতো। অথচ আমাদের লেখক বন্ধুরাইতো তাদের অবস্থান পরিস্কার করছে না। কিন্তু কেন? মধ্যযুগীয় চাপাতীর কোপের ভয়ে?! আমরাতো এমনিতেই মরি - ক্ষণে ক্ষণে মরি, দিনের পর দিন মরি। এমন অসহ্য মরার চেয়ে একবার মরাই কি উত্তম নয়!
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজের দাবী ড. আজাদের সুচিকিৎসার জন্যে বিদেশে না পাঠানো পর্যন্ত তাঁরা তাদের ধর্মঘট পত্যাহার করবে না। এ ক্ষেত্রে আমার এক বিশাল জিজ্ঞাসা - দেশের বাদবাকী শিক্ষকগনের কী কোনই দায়-দায়িত্ব নেই ড. আজাদের ব্যাপারে!?

বাংলাদেশের সকল লেখক-বুদ্ধিজীবিগন কি এ ঘটনায় এক কাতারে দাঁড়িয়ে বলতে পারছেন না যে - আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করি। **ঘৃনা করি... ঘৃনা করি... ঘৃনা করি....**। মানি না এ অনিয়ম।
মধ্যযুগীয় বর্বর হামলার ভয়েই কী সবার বুক ধড়পড় করছে? অনিয়মের প্রতিবাদ করতে হয় স্বনামে সাহসীকতার সাথে ছদ্ম নামে নয়। লেখক সব সময়ই সত্য - সুন্দরের পূঁজারী। অসুন্দরের তীব্র প্রতিবাদী। আমরা জানি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে রক্তাক্ত হতে হয়। আসুন একবার রক্তাক্ত হই।

আসুন না প্রতিদিন পলে পলে মরার চেয়ে আমরা একবারই মরার জন্যে প্রস্তুতি নিই। আমাদের কলমের কালিতে ওদেরকে তীব্র ঘৃণার অনলে ছাই ভস্ম করে দিই।

ওয়েব সাইট ‘ভিন্নমত’ ও ‘সদালাপ’ তাদের অবস্থান পরিস্কার করেছেন। একটি বিশেষ কলাম খুলে লেখকদের তীব্র ঘৃণা আর প্রতিবাদের শব্দগুলো প্রকাশের জায়গা করে দিয়েছেন। এজন্য তাঁরা দু’জন সম্পাদকই তাদের পবিত্র দায়িত্বটি পালন করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

মধ্যপ্রাচ্যে জেনেছি অনেক বাঙালি লেখক রয়েছেন। যাঁরা জীবন-জীবিকার পাশাপাশি লেখালেখির চর্চা করে থাকেন। কিন্তু আপনারা নীরব কেন? আসুন আমরা বিস্ফোরিত ঘৃনায় এবং প্রতিবাদে ফেটে পড়ি । মরতে হয় একবারই মরি। ওদের বুঝিয়ে দিই আমাদের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে শুধু পবিত্রই নয়। পৃথিবীর যে কোন শক্তির চেয়েও সেরা শক্তিশালী। বর্তমান মার্চ মাসটি বাঙালির স্বাধীনতার মাস। এদিন থেকেই তো আমরা একত্রিত হয়েছিলাম স্বাধীনতার জন্যে। আসুন অসুর শক্তিকে দমন করতে আবার এক হই। সবার জন্যে থাকলো স্বাধীনতার মাসের শাপলা - দোয়েল শুভেচ্ছা।

৭ই মার্চ ২০০৪।

মরুপলাশ এর সম্মানিত লেখক-পাঠকদের অভিযোগের উত্তরে
কিছু প্রস্তাব
সকল বাংলা ওয়েব ম্যাগাজিনগুলোর সুহৃদ সম্পাদক বন্ধুবরেষু

উপরের লাল রঙের শিরোনামে আমার একটি নিবন্ধ রয়েছে যা কয়েকটি ওয়েবম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। আসলে লেখাটি প্রকাশের জন্য নয় এমন কথা বলেই সকল বাংলাওয়েব ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের বরাবরে পাঠিয়েছিলাম। কেউ কেউ আমার কথা রক্ষা না করে লেখাটি প্রকাশ করে দিয়েছেন। তবে ওনারা এ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। বোঝা গেছে ওনারা কোন নিযমনীতির মধ্যে আসতে রাজী নন।

মুক্তবাজার অর্থনীতির মতোই তারা চলতে চান। চলুন গিয়ে তাতে আমার আপত্তি থাকার কথা নয়। আমিতো জাষ্ট প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং বলা যায় বন্ধু ভেবে সবাকে অনুরোধ করেছিলাম যে, আসুন আমরা একটি নিয়মে গন্ডির মধ্যে আসি। কিন্তু ফলাফল নিম্নচাপ। একজন প্রাক্তন সম্পাদক তো রীতিমতো আমার সেই লেখা নিয়ে সমালোচনা করে বললেন। আর অন্যরা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কেননা ওনারা হচ্ছেন অনেক বড় মাপের সম্পাদক, লেখক, গুনীজ্ঞানী বুদ্ধিজীবি। ওনারা আমার কথায় আসবেন কেন?????!

সেই নিবন্ধে আমার উত্থাপিত এই সকল প্রস্তাবগুলো সদালাপ এর প্রাক্তন সম্পাদক জনাব আ.স.ম. জিয়াউদ্দিন ভাই কিছুটা বাঁকা নজরে দেখেছেন বলে আমার মনে হয়েছে এবং তিনি বেশ কিছু সুপরামর্শ ও উপদেশ আমার প্রতি বর্ষণ করেছেন। আর তা আবিস্কার করলাম তাঁর প্রায় নিয়মিত কলাম চিরকুট ৩৮এ। সে জন্য ওনাকে সীমাহীন ধন্যবাদ।

কেউ কেউ পরোক্ষভাবে আমার প্রস্তাবকে কটাক্ষও করেছেন। আমাদের অধিকাংশ বাংলা ওয়েব ম্যাগাজিনগুলো কোন নিয়ম-নীতির মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখতে চায় না। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে এরা গা-ভাসিয়ে দিয়েছেন। তাই এগুলোতে অনেকেই যাচ্ছে-তাই বলে এবং ঘটিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে নির্বিঘ্নে।

তবে আমি তা সিরিয়াস্‌ভাবে মেনে চলি এবং চলবো। যার ফসল অনেক লেখকের পূর্ণাঙ্গা ডাটা সরবরাহে ব্যর্থ বলে তাদের লেখা আমি আমার ওয়েবে পোষ্ট করিনি। বিশেষ করে সউদী আরব থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত ওয়েব ম্যাগাজিন বলেই আমাকে সিরিয়াসলি এখানকার অনেকগুলো নিয়মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হয়, মেনে চলতে হয়। তাই লেখকবন্ধুগন দয়া করে অভিমান করবেন না। আপনাদের ছবি সহ পূর্ণাঙ্গা ডাটা ছাড়া কোন লেখাই আমার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলে দুঃখিত।

০৪ আগষ্ট ২০০৫ইং

প্রকাশনার ২০ বছর

সম্পাদক, 'মরুপলাশ' রূপসী চাঁদপুর, মোহনা
রিয়াদ, সউদী আরব।
E-mail: marupalash@yahoo.com
marupalash@gmail.com
www.marupalash.com